শ্রীরসিকচন্দ্র বসু

প্রণীত।

আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে

প্রকাশিত।

ঢাকা,

আশুতোষ-প্রেসে

শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭,

OPINION.

KALAPAHARA by Babu Rasik Chandra Basu.

It is difficult to describe exactly the nature of the book; for it partakes of the character of a novel, a biography and a philosophical pamphlet written in defence of the popular aspect of Hinduism, which from a misunderstanding of its true spirit is often stigmatised as idolatry. It is from this misconception of the inner meaning of popular Hinduism, the author states, that the hero of the story, the notorious iconoclast, Kálápáhára, an apostate to Islamism, proceeded with the rancour of a renegade to demolish the images and defile the shrines of celebrated Hindu deities. The author then goes on to say that when it was explained to him by his preceptor that Hinduism in its present shape is nothing but a popular development of the absolute monism (or pantheism) of the Vedanta School, Kálápáhára repented for his folly, gave up worldly pursuits and became a religious mendicant together with his devoted Mahomedan wife.

It must be said that it is no small credit of the author that the hero of his book, inspite of his iconoclasm, does never lose the sympathy of Hindu readers. In Dulali, her female attendant and the hero, the author has set up high ideals of unselfish love, devotion and noble manhood.

The conversation between the hero and his preceptor is very often carried on in a lofty strain and is too high for the ordinary reader.

Great credit is due to the publisher for the neat printing and excellent get up of the book.

DACCA } (Sd.) BIDHUBHUSHAN GOSWAMI
The 15th August, 1910. } Professor of Sanskrit.

যিনি

পরমানন্দের আহ্বানে

আসক্তির মোহপাশ ছিন্ন করিয়া

বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়াছেন,

সেই

দ্বন্দ্বাতীত,

জীবন্মুক্ত, অনিকেতন,

সিদ্ধ পুরুষ,

বাবাজীউর চরণ কমলে

ভক্তির পুষ্পচন্দনরূপে

তদীয় দাসের

এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থ

অর্পিত হইল।

কালাপাহাড়।

১

আনন্দ।

গঙ্গাতীরে বীরজাওন গ্রামের (১) এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র আম্রকানন। সেই আম্রকাননের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বারদেশে প্রেমানন্দ বাবাজী কুশাসনে বসিয়া আছেন।

বাবাজীর মস্তক মুণ্ডিত, কেবল শুভ্র কেশের একটি ক্ষীণ গুচ্ছ দিব্য-জ্যোতিঃশিখার ন্যায় মস্তকের পশ্চাদ্দেশে লম্বমান রহিয়াছে। বদনমণ্ডলে শ্মশ্রুগুম্ফের চিহ্ন নাই। শরীর তপঃকৃশ, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। মুখমণ্ডলে শান্তি ও প্রেমের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ।

বাবাজী নয়ন মুদ্রিত করিয়া নাম জপ করিতেছেন।

তখন বৈশাখ মাস। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ-দক্ষিণ-পবন আম্রপল্লবগুলি ঈষৎ কম্পিত করিয়া ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, পত্র-শ্যাম সহকার-শাখায় বসিয়া কোকিল আনন্দে কু-উ কু-উ রবে

(১) জেলা রাজসাহী, থানা মান্দার অন্তর্গত।

করিতেছে। বাসন্তী শোভায় জগৎ আনন্দময়। বৃক্ষে, লতায়, পত্রে, পুষ্পে ও ফলে, সে আনন্দ উথলিয়া পড়িতেছে। বাবাজী আনন্দ-কাননে বসিয়া পরমানন্দে মগ্ন আছেন।

এমন সময় একটি নবীন যুবক ধীরে ধীরে সেই আম্রকাননে প্রবেশ করিল। যুবক, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্তি; কাঞ্চনপ্রতিমার মতই সেই অঙ্গ শোভা ও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বশ্রীতে উজ্জ্বল। যুবকের পরিধানে শুভ্র কৌষেয় বসন, স্কন্ধে শুভ্র কৌষেয় উত্তরীয়, দক্ষিণ বাহুতে ইষ্টকবচ, মস্তকে সুবিন্যস্ত দীর্ঘ কৃষ্ণকেশগুচ্ছ, ললাট—চন্দন-লিপ্ত, মুখমণ্ডল—নবোদ্ভিন্ন গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজির কৃষ্ণরেখায় ভ্রমরাসীন প্রফুল্ল প্রভাত কমলের ন্যায় সুন্দর।

যুবক বীরজাওনের ভৌমিক নয়নচাঁদ রায়ের পুত্র কালাচাঁদ রায়। কালাচাঁদ, প্রেমানন্দ বাবাজীর শিষ্য, প্রত্যহ অপরাহ্নে বাবাজীকে দর্শন করিতে আসেন। [illegible] আসিয়াছেন।

কালাচাঁদ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। কুটীরের সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন, বাবাজী জপে নিবিষ্ট; চক্ষু মুদ্রিত, কদাচিৎ অধর একটু কম্পিত হইতেছে। সেই প্রসন্নমূর্ত্তি হইতে প্রেম ও আনন্দ যেন গলিয়া পড়িতেছে। কালাচাঁদ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

[illegible] বাবাজীর নামসংখ্যা পূর্ণ হইল। চক্ষু মেলিলেন। কালা[illegible] সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন, বাবা, কতক্ষণ এসেছ? [illegible]

প্রেমানন্দ বাবাজী ও কালাচাঁদ।

ASUTOSH PRESS, DACCA.

কালাপাহাড়—৩য় পৃষ্ঠা।

প্রসন্নদৃষ্টি ও স্নেহমাখাস্বরে বাৎসল্য উথলিয়া পড়িল।

যুবক, বাবাজীর পদধূলি মস্তকে দিয়া একটু দূরে বসিল।

বাবাজী কহিলেন, বাবা, জগতের দিকে চাহিয়া আজ কেমন দেখ?

যুবক। বড়ই প্রফুল্ল, সবই যেন আনন্দময়।

বাবাজী। হাঁ বাবা; জগৎ আনন্দময়,—পরমানন্দের আনন্দ-লীলাকানন। ইহার আদি, মধ্য, শেষ কেবলই আনন্দ। ঋষিরা বলিয়াছেন:—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি।"

এ জগৎ—এ ভূতগণ আনন্দ হইতে হইয়াছে, আনন্দেই বাঁচিয়া আছে, আনন্দেই লীন হইবে। জন্মে আনন্দ, জীবনে আনন্দ, মরণেও আনন্দ। এ জগৎ আনন্দে উন্মত্ত। আনন্দই জগৎ অথবা জগৎই আনন্দ।

যুবক বিস্মিত হইয়া কহিলেন, প্রভু, জগৎ যদি আনন্দ, তবে জীবের দুঃখ দেখি কেন?

বাবাজী। বাবা বিস্ময় বোধ করিও না। দুঃখ বলিয়া কিছু নাই। দুঃখ, জীবের মনের ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর করিয়া অখণ্ড আনন্দ—পরমানন্দ লাভই সাধনা।

যুবক। প্রভু, কিরূপে এই অখণ্ড আনন্দ লাভ হইতে পারে?

বাবাজী। প্রথমে বুঝ, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, এসকল মনের

অনুভূতি মাত্র। মনকে সহিষ্ণু করিয়া আত্মবশীভূত করিতে পারিলেই এসকল দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া যায়। সুতরাং তুমি যে দুঃখের কথা বলিতেছ, তাহার অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। কিন্তু এ সাধনা কঠোর। ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

"ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ"

চঞ্চল মন সহজেই ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে বিচলিত হইয়া পড়ে। আজি তোমাকে আনন্দলাভের সহজ সাধনার কথা বলিব। এই যে বিশ্বব্যাপী মহানন্দ, এই পরমানন্দের কণা প্রতি জীবহৃদয়েই আছে। সেই আনন্দকণাই ভালবাসা, প্রেম বা প্রীতি। পাত্র-ভেদে উহার বিকাশের স্নেহ, প্রণয়, ভক্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম— ভক্তি হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে প্রেম গাঢ়তর। এই স্নেহ, প্রণয় বা ভক্তি নির্ম্মল হইলে মানুষ সহজে অখণ্ড আনন্দ লাভ করিতে পারে। কিন্তু বাবা, স্বার্থের মলিনতা সহজে কাটে না, মানুষ আপনাকে ভুলিয়া পরের হইতে পারে না। তাই, সকলের মধ্যে সেই আনন্দকণা থাকিলেও সকলের ভাগ্যে পরমানন্দ লাভ ঘটে না।

"নাভ কমল মে হ্যায় কস্তূরি,
ক্যায়সে ভরমে মৃগ বন্‌কা রে।"

কস্তূরি আপনার নাভির মধ্যে রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, কস্তূরির অনুসন্ধানে বনের হরিণ পাগলের মত ছুটিয়া বেড়ায়। হায়, জীবের কি দুর্ভাগ্য !

যুবক। ভক্তি, স্নেহ, প্রেমে আবার স্বার্থ কি প্রভু ?

বাবাজী। এসকলের মধ্যেও স্বার্থ থাকে এবং সাধারণতঃ স্বার্থ থাকাই সম্ভব। তুমি তোমার পিতাকে ভক্তি কর, কতকটা শাস্ত্রশাসনে—পিতাকে ভক্তি না করিলে অধর্ম্ম হইবে। কতকটা কৃতজ্ঞতায়—পিতা তোমাকে রক্ষা ও পালন করিয়াছেন, আপনার বিত্তসম্পদ্ তোমাকে দিয়াছেন। কতক ভয়েও বটে। তোমার পত্নী তোমাকে যে প্রীতি করেন, তাহাও এইরূপ—কতক শাস্ত্রশাসনে বা সমাজশিক্ষায়, কতক কৃতজ্ঞতায়, কতক ভয়ে, হয় ত প্রাণের টানও কিছু থাকিতে পারে। এই প্রাণের টানটুকুই নিঃস্বার্থ প্রেম। ক্রমে এ প্রাণের টান বাড়িতে থাকিলে, স্বার্থের হেতুবাদ লোপ পাইতে থাকে। শেষে হয় ত সেই প্রীতি একবারে স্বার্থশূন্য হইয়া নির্ম্মলও হইতে পারে। কিন্তু উহা সাধনসাপেক্ষ।

যুবক। তবে কি জগতে নিঃস্বার্থ প্রীতি নাই?

বাবাজী। দুর্ল্লভ হইলেও আছে। কিছুই করে না, অথচ, দেখিলেই আনন্দ হয়, না দেখিলে জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হয়, —সৌভাগ্যক্রমে এমন বস্তুও মিলে। সে মনের মানুষ যখন আসে, তখন প্রীতি আপনি স্ফুরিত হয়। এ প্রেমের পাত্রাপাত্র নাই, জাতিবর্ণ নাই, ইহাতে কামনার কলুষ নাই। এই প্রেমই পরমানন্দ। মানুষকে ভালবাসিয়া নিঃস্বার্থ-প্রীতি করিয়াই মানুষ পরমানন্দ লাভ করে। মানুষই মানুষের ভগবৎ প্রাপ্তির—ব্রহ্মাস্বাদের প্রথম সোপান, প্রধান অবলম্বন।

যুবক। তবে বুঝিলাম প্রভু, মানবপ্রেমই পরমানন্দলাভের পথ।

বাবাজী। কেবল পথ নহে। মানবপ্রেম আর পরমপ্রেম একই কথা, যেমন ঘটাকাশ আর মহাকাশ, বস্তু একই। তবে বাবা নিষ্কাম হওয়া চাই, আপনাকে ভোলা চাই। কাম আর প্রেম দুই পৃথক্ পদার্থ। আপনাকে ভুলিতে না পারিলে, আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-ইচ্ছা ছাড়িতে না পারিলে প্রেম হয় না। আনন্দলাভের সৌভাগ্য, কামীর নাই।

যুবক। এই যে বলিলেন, প্রেমে জাতি বর্ণ নাই, ইহার অর্থ কি ?

বাবাজী। জাতি বর্ণ মানবের কল্পিত; প্রেম ত মানুষের বিধি-নিষেধের অধীন নহে। স্মৃতির ব্যবস্থা লইয়া গৃহস্থালী করা চলে, কিন্তু স্মৃতি দেখিয়া ভালবাসা চলে না। চুম্বককে লৌহ আকর্ষণ করিতে নিষেধ করিলে, সে কি তাহা মানে ? কাজেই প্রেমিকের জাতির বিচার নাই। প্রেমের শ্রীক্ষেত্রে সবই এক জাতি। প্রেমের নাম আত্মোৎসর্গ—আপনাকে বিকাইয়া দেওয়া, সেখানে জাতিকুলের বিচার কি ? সেখানে সুধু :—

যো কুছ মুঝে তুঁহি হৈ।

সেখানে কেবলই তুঁহি তুঁহি।

গোপীরা—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে কোন মূর্ত্তি।
যাহা যাহা নেত্রে পড়ে, তাহা কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি ॥"

কাজেই গোপরমণীদিগের কাম, প্রেমে পরিণত হইয়াছিল।

যাক্ এ কথা। তোমাকে ত কাল গৌড়ে যাইতে হইবে দেখিতেছি। বাদশাহ সোলেমান তোমাকে ডাকিবেন।

যুবক। প্রভু, এ-কথা ত শুনি নাই। বাদশাহ বোধ হয় আমাকে জানেন না। আমি গৌড়ের দরবারে কখনও যাই নাই। যাইবার ইচ্ছাও নাই।

বাবাজী। ইচ্ছা না থাকিলেও যাইতে হইবে। কর্ম্ম-সূত্র তোমাকে আকর্ষণ করিতেছে, থাকিতে পারিবে না।

যুবক। যাত্রার ফল কেমন দেখিতেছেন?

বাবাজী। শুভাশুভ দুই-ই আছে। কর্ম্মস্রোত তোমাকে অনেক দূরে লইয়া যাইবে। বাবা, ভবিষ্যৎ জানিয়া লাভ কি? যাহা ভবিতব্য, তাহা হইবেই। পুরুষকারে দৈব প্রতিরুদ্ধ হয় না।

অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম
তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।

ভগবানেরই ভ্রম হইয়াছিল। মানুষের আর কথা কি? ভবিষ্যৎ ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

কালই গৌড়ে যাইও। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক।

যুবক। আবার কখন শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব?

বাবাজী। আমার সহিত আর এখানে তোমার দেখা হইবে না। আমি তীর্থদর্শনে যাইব। কাশীতে তোমার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে।

তখন স্নিগ্ধ সন্ধ্যানিল গঙ্গার কলনাদ বহন করিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমে প্রবাহিত হইতেছিল। গুরু শিষ্য উভয়ে রজতশুভ্র গঙ্গাস্রোতের দিকে চাহিয়া গাহিতে লাগিলেন—

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি, বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি,
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি, ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।

সাম-নির্ঘোষ-মুখর শান্ত তপোবনের ন্যায় মন্দাক্রান্তার গুরু-গম্ভীর স্বরলহরীতে সেই আম্রকানন স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইতে লাগিল।

২

কর্ম্মসূত্র।

বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়ের দরবার গৃহে রত্নখচিত শ্বেত সিংহাসনে বসিয়া বাদশাহ সোলেমান, উজীর করিম খাঁকে বলিলেন, রাজধানীর ফৌজদারের পদে কাহাকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে?

উজীর, সেলাম করিয়া কহিলেন, শাহেনশার মর্জ্জি হইলে মুন্সী হামিদ খাঁকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। হামিদ খাঁ বাদশাহের বহুদিনের ভৃত্য।

বাদশাহ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, হাঁ, হামিদ খাঁকে জানি; গৌড় অধিকারের সময় এই হামিদ খাঁই সকলের আগে পলাইয়াছিল। গৌড়ের ফৌজদারী এমন বীরের কর্ম্ম নয়।

উজীর অপ্রতিভ হইলেন। লজ্জায় তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ
য়া উঠিল।

বাদশাহ। ঐকাজে কোন হিন্দুকে নিযুক্ত করিলে কেমন
?

উজীর। রাজধানীতে এমন কোন হিন্দু দেখি না, যাহার
ার নগর রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তবে শাহেন
যাহাকে পছন্দ করিবেন, সে উপযুক্ত হইবার সম্ভব। বাদশাহ
হার কথা মনে করিতেছেন?

বাদশাহ। নঞান রায়ের কথা আপনার মনে পড়ে?

উজীর। বান্দার কিছুই ভুল নাই। কিন্তু আমাদের সেই
াতন বন্ধু ইহলোকে নাই।

বাদশাহ। তাহা জানি। আমি নঞান রায়ের পুত্রের কথা
করিয়াছি। এই দরবারের মধ্যে কে নঞান রায়ের পুত্রের
া বলিতে পারে?

সিন্দুরী চাকলার মৌলবি হাফেজ উদ্দীন কুর্ণিস করিয়া
হলেন, নঞান রায়ের পুত্র কালাচাঁদ এ বান্দার নিকট পারসী
্যয়ন করিয়াছে। কালার শরীরে আঠার যোয়ানের বল।
ার মত তীরন্দাজ ও সওয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে আর নাই।

বাদশাহ প্রসন্ন বদনে কহিলেন—নঞান রায়ের পুত্রের
ত্রের কথা আপনি কি জানেন?

মৌলবী সাহেব পুনরায় কুর্ণিস করিয়া কহিলেন, কালার
কথা সেই কাজ। কালা, নঞান রায়ের মুখ উজ্জ্বল করি-

য়াছে। সে পুতুল পূজা করে, এই এক দোষ, নহিলে কালার আর দোষ নাই।

মৃদু হাসিয়া বাদশাহ উজীরকে কহিলেন, কালাচাঁদ, নিমক্ হালালের বেটা; সে যে বীর, তাহা জানিয়াছি। কালাচাঁদকে রাজধানীর ফৌজদার নিযুক্ত করিব মনে করিয়াছি, আপনি কি বলেন?

সসম্ভ্রমে উজীর কহিলেন, শাহেনশার মর্জ্জি যে উত্তম, তাহাতে সন্দেহ কি? কালারায় সদ্বংশ জাত, বীর ও বিত্তশালী। সে ফৌজদারের উপযুক্ত বটে।

বাদশাহ কহিলেন, তবে এখনই জরুরি পরওয়ানা সহ সওয়ার পাঠাইয়া দিন।

বাদশাহের আদেশ-পত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ পাঁচ জন সওয়ার কালাচাঁদ রায়কে আনিতে গমন করিল।

বাদশাহের মোহরযুক্ত পরওয়ানা পাইয়া কালাচাঁদ বুঝিলেন, গুরুদেব সত্যই বলিয়াছেন; কর্ম্মসূত্র আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। ইচ্ছা না থাকিলেও গৌড়ে যাইতে হইতেছে।

কালাচাঁদ, মায়ের নিকট বাদশাহী আদেশের কথা বলিলেন। মা বলিলেন, বাছা, বাদশাহের হুকুম, যাইতেই হইবে। যে তোমাকে চায়, তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পার না।

মায়ের পদধূলি মাথায় লইয়া, কালাচাঁদ গৌড়ে যাত্রা করিলেন।

গৌড়ে আসিয়া কালাচাঁদ বাদশাহের দরবারে হাজির হই-

লেন। উজীর তাহাকে বাদশাহের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিলেন, শাহেন শা, এই নঞান রায়ের পুত্র কালাচাঁদ রায়। কালাচাঁদ ভূমিস্পর্শ করিয়া তিন বার কুর্ণিস করিলেন।

সেই অনিন্দ্য সুন্দর দীর্ঘায়ত শরীর দেখিয়া প্রফুল্ল মুখে বাদশাহ কহিলেন, তোমারই নাম কালাচাঁদ রায়?

কালাচাঁদ পুনরায় কুর্ণিস করিয়া কহিলেন, বাদশাহের ভৃত্যের ঐ নামই বটে।

বাদশাহ। তোমাকে কেন ডাকিয়াছি, কিছু অবগত হইয়াছ কি?

কালাচাঁদ। অধীন, তাহার কিছুই অবগত নহে। বাদশাহের জরুরী হুকুম পাইয়া এইমাত্র দরবারে হাজির হইয়াছি।

বাদশাহ। তোমার পিতা নঞান রায় এ সরকারের হিতৈষী বন্ধু—নিমক্‌হালাল ভৃত্য ছিল। তুমি তাহার পুত্র। তোমাকে গৌড়ের ফৌজদার নিযুক্ত করিলাম। আশা করি, তুমি ইমান্ ঠিক রাখিয়া,তোমার পিতার ন্যায় সরকারের হিতানুষ্ঠান করিবে। আজি হইতে তুমি আশা-সোটা ছাতি ও ডঙ্কা সহ হাজারি মন্‌সবদারের পদ পাইলে। তোমার দৈনিকব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দশ রূপাইয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। উজীরের নিকট হইতে কর্ম্মভার বুঝিয়া লও।

কালাচাঁদ ভূমিন্যস্ত জানু হইয়া,যোড়হাতে কহিলেন, শাহেনশা, দুনিয়ার মালিক—এ গরীবের শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে সরকারের অহিত হইতে পারিবে না। নিমক্‌হালালের রক্তে এ

শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, নিমকের ধর্ম্মরক্ষা করিয়া, এ দেহের পতন হইবে।

বাদশাহ সোলেমান ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, নহিলে তোমায় ডাকিতাম না।

সেই দিন হইতে কালাচাঁদ গৌড়ের ফৌজদার হইলেন। পাঠান বাদশাহ হিন্দুর হাতে রাজধানী সমর্পণ করিলেন। কিন্তু সে কালে ইহা অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া কাহারও মনে হইল না।

৩

"নয়নে নয়নে,　　　　　দরশ করিতে
তাহে উপজিল " পী "।

রাজপ্রাসাদের অদূরেই ফৌজদারের বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কালারায় সেই নির্দ্দিষ্ট ভবনে বাস করিতেন।

কালারায় প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যা ও পূজা করিতেন, তারপর দরবারের পোষাক—চাপকান, চোগা, পাগড়ী ও নাগরাই জুতা পরিয়া দরবারে যাইতেন। আগে আশা-সোটাধারী বরকন্দাজ, পাছে অশ্বারোহী সৈনিক, মধ্যে ফৌজদার কালারায় শিবিকা বা অশ্বে আরোহণ করিয়া বাহির হইতেন। মধ্যাহ্নে দরবার ভঙ্গ হইত। বৈকাল বেলা আবার দরবার বসিত। সেকালে দুই বার দরবার বসিবার নিয়ম ছিল।

প্রত্যহ প্রাতে কালাচাঁদ মহানন্দায় স্নান করিতে যাইতেন।

রাজপুরীর প্রাচীরের নিকট দিয়া তাঁহাকে মহানন্দায় যাইতে হইত। মহানন্দায় যাইবার এইটিই সরল পথ ছিল।

প্রভাতে প্রফুল্লপ্রকৃতির দিকে চাহিয়া, প্রাতঃসমীরণের স্নিগ্ধ স্পর্শ পাইয়া, কালাচাঁদ অন্তরে বাহিরে এক আনন্দ অনুভব করিতে করিতে মহানন্দার তীরে যাইয়া দাঁড়াইতেন। যে আনন্দ তাঁহার মনে, যে আনন্দ সমীরণে, যে আনন্দ বিশ্বপ্রকৃতিতে, দেখিতেন, মহানন্দাও সেই আনন্দে চঞ্চল হইয়া কলকলনাদে অবিরাম বহিয়া যাইতেছে। তখন তাঁহার মনে হইত, বাবাজী সত্যই বলিয়াছেন, আনন্দই জগৎ, জগৎই আনন্দ।

বিশ্বপ্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে কালাচাঁদ মহানন্দায় অবতরণ করিয়া স্নান ও তর্পণ করিতেন। তার পর শুভ্র গরদের বস্ত্র পরিয়া ধীরে ধীরে আবাস অভিমুখে গমন করিতেন। তাহার উন্নতোজ্জ্বল গৌরকান্তি, মস্তকে দীর্ঘ নীলকেশ, বক্ষে লম্বমান শুভ্র উপবীত—সে বর বপু যে দেখিত, সে-ই সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইত।

কিন্তু এক জন সে মূর্ত্তি,—তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেমন কালো মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে,—তেমনই অনিমেষনেত্রে চাহিয়া দেখিত। এক দিন নয়, প্রত্যহ প্রভাতে বাদশাহের কন্যা কুমারী দুলালী ছাদে উঠিয়া, মহানন্দার পথের দিকে চাহিয়া, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন। কালাচাঁদ পথে বাহির হইলেই তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। কালাচাঁদ মহানন্দা অভিমুখে যাইতেন, দুলালী অনিমেষে চাহিয়া দেখিতেন, যত দূর দৃষ্টি চলে, তত দূর দেখি-

তেন। যখন আর দেখা যাইত না, যখন আর দৃষ্টি চলিত না, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছল ছল নেত্রে বসিয়া পড়িতেন। আবার কালাচাঁদ গৃহাভিমুখী হইলেই তেমনই চাহিয়া দেখিতেন। তরুণী বুঝিত না,যে, এ দেখায় কোন দোষ আছে। সে না দেখিয়া পারিত না। দুটি চক্ষুতে দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হইত না। তরুণীর মনে হইত ঃ—

"দুটি আঁখি নিমিখ, মূরখ বড় বিধিরে;
না দিলে অধিক নএগন।"

এমন করিয়া দেখিয়া দেখিয়া, অনেক দিন গেল। প্রথমে নয়নপ্রীতি, তার পর চিত্তাসঙ্গ, তার পর সঙ্কল্প স্থির হইল। ইহ-জগতের কেহ জানিল না, ধীরে ধীরে তরুণীর হৃদয় কালা-ময় হইয়া গেল।

এক দিন প্রভাতে দুলালী ছাদে বসিয়া আছেন, নিকটে সঙ্গিনী মোতিয়া। কালাচাঁদ প্রাতঃস্নান করিয়া, গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছেন। দুলালী, স্বরমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সেই মধুর গীতি কর্ণ ভরিয়া পান করিতেছেন; প্রভাতের প্রফুল্ল কমলিনী যেমন উজ্জ্বলকান্তি প্রাতঃসূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে, তেমনই সেই গৌরকান্তির দিকে চাহিয়া আছেন। দুলালীর মুখে বাক্য নাই, চক্ষুতে নিমেষ নাই, শরীরে স্পন্দন নাই। দুলালীকে তদবস্থ দেখিয়া মোতিয়া কহিল,—সাজাদী কি দেখিতেছ? মোতিয়ার আহ্বানে দুলালীর ধ্যান ভাঙ্গিল। মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তুইও দেখ্ না কেন?

মোতিয়া একটু অগ্রসর হইয়া পথের দিকে চাহিল। দুলালী কহিলেন, মোতিয়া, কি দেখিলি ?

মোতিয়া। একটি মানুষ।

দুলালী। তোর মতন কি ?

মোতিয়া। আমার মতন হবে কেন ? ও হ'ল পুরুষ।

দুলালী। মোতিয়া, ঐ পুরুষই আমার বর।

মোতিয়া। হ'তেও পারে। ছেলে বেলার পুতুল খেলার কথা মনে পড়েছে কি ? তুমি ত আর পুতুল নও যে, পথের মানুষ ধ'রে, গাছ পাথর ধ'রে বর কর্‌বে ? বাদশাহের মেয়ে না হয়ে, দোকানের পুতুল হ'লে তা পার্‌তে।

দুলালী। না মোতিয়া, পুতুল খেলা নয়। সত্য বল্‌ছি, উনিই আমার স্বামী। এ শরীর ও মন উঁহাকে দিয়াছি।

মোতিয়া শিহরিয়া উঠিয়া দুলালীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, দুলালীর নেত্র অশ্রুপূর্ণ। বুঝিল, পরিহাস নয়। বিষম কথা।

মোতিয়া কহিল, সাজাদী করিলে কি ?

দুলালী। কেন মোতিয়া, আমি ত ঠিকই করিয়াছি। প্রাণ যাহাকে চায়, তাহাকেই প্রাণ দিয়াছি।

মোতিয়া। শেষ রক্ষা করিতে পারিবে কি ?

দুলালী। মোতি, এক আকাশে দুই সূর্য্য থাকে না। এ দেহ মন আর কাহারও হইতে পারিবে না।

মোতিয়া। বাদশাহ কি বলিবেন ? এমন সোহাগের মেয়ে

একটা পথের মানুষকে বিলাইয়া দিতে তিনি সম্মত হইবেন কি সাজাদী একি পুতুলের খেলা ? তুমি করিলে কি ?

দুলালী। আর, বাদশাহ যদি জানেন যে, তাঁহার মেয়ে অপাত্রে আত্মসমর্পণ করে নাই, তবে সম্মতিও দিতে পারেন। ভবিষ্যৎ কি হইবে, মোতিয়া, তাহা ভাবি নাই, ভাবিতেও চাহি না। ভাবিয়া কি মন দেওয়া যায়, মোতি ? ঐ যে মহানন্দা চলিয়াছে, ও কি, ভাবিয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়াছিল ?

মোতিয়া। তুমি বলিলে, অপাত্রে আত্মসমর্পণ কর নাই। পথের মানুষ, অপাত্র কি সুপাত্র, কি করিয়া জানিলে ? দূতী পাঠাইয়াছিলে কি সাজাদী ?

হাসিতে হাসিতে দুলালী কহিলেন;—"দূর বাঁদী, দূতী পাঠাইবার কি দায় লো ? তোর চোখ্ নাই ; চক্ষু থাকিলে তুইও দেখিতে পাইতি, অপাত্র কি সুপাত্র। এদিকে আয়, আমি তোকে দেখাই"।

মোতিয়া। ওদিকে কেন ? আমার চোখে চস্‌মা দিবে নাকি ? আমার চাল্‌সে ধরে নাই।

দুলালী। চস্‌মা নয় লো, এদিকে আয়, তোর চোখে জ্ঞানাঞ্জন দেই।

মোতিয়া উঠিয়া দুলালীর নিকটে গেল। দুলালী কহিলেন, বল দেখি ও পুরুষটির বয়স কত ? মোতিয়া আরও এক বার ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, ২৫। ২৬ বৎসর হইতে পারে।

দুলালী। তবে বয়সটা বরের মতই ?

মোতিয়া—তা বটে।

দুলালী—বল দেখি, দেখ্‌তে কেমন ?

মোতিয়া—সুন্দর, অপূর্ব্ব সুন্দর বটে।

দুলালী—গৌড়ে এমন আর একটি দেখেছিস্ কি ?

মোতিয়া—না সাজাদী ; কিন্তু।

দুলালী—কিন্তু কিলো ?

মোতিয়া—সুন্দর ও যুবক হইলেই বর করতে হবে ?

দুলালী—দূর বাঁদী, চক্ষু মেল্, আরও দেখ্। উহাঁর হাতে কি দেখ্‌ছিস্ ?

মোতিয়া—সোণার একটা কি।

দুলালী—সোণার কোশা। হাতে সোণার কোশা, সঙ্গে ছাতাবরদার, ইহা দেখিয়া কিছু বুঝিলি না ?

মোতিয়া—হাঁ সাজাদী, বুঝিলাম, ইনি কোন মন্‌সবদার, কি ভূঁইয়া।

দুলালী—তবে সম্পদ্‌শালী বটে ?

মোতিয়া—তা ত বটেই ; নহিলে কি ছাতাবরদার সঙ্গে চলে ?

দুলালী—শরীরটা কেমন দেখিতেছিস্ ?

মোতিয়া—পালোয়ানের মত।

দুলালী—গলায় কিছু দেখিতেছিস্ ?

মোতিয়া— কতকগুলি সূতা। হিন্দুরা ওগুলি গলায় দেয়। সাজাদী উনি হিন্দু।

দুলালী—হাঁ হিন্দু বটে। সব হিন্দুতে ঐ সূতা গলায় দেয় না। যাহারা বড় জাতি—ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, তাহারাই উহা গলায় দেয়। পৈতা দেখিয়া, মোতিয়া, আমি বুঝিয়াছি, উনি উচ্চ জাতি। ঐ যে, উনি কি বলিতেছেন, শুন্‌ছিস্ কি ?

মোতিয়া—হাঁ শুনেছি, বেশ ত লাগে।

দুলালী—এমন বেশ কথা যিনি বলিতে পারেন, তিনি যে *মূর্খ নন, তাহা বুঝিতে পারিলি ?*

মোতিয়া—বুঝিয়াছি।

দুলালী—তবেই দেখ, মোতিয়া, দূতী না পাঠাইয়া, জিজ্ঞাসা না করিয়াও আমি বুঝিয়াছি, যুবক উচ্চ জাতি, বীর, বিদ্বান্ বিত্তশালী। রূপ ত তুই-ই দেখিতেছিস্।

মোতিয়া। বুঝিলাম সাজাদী, কিন্তু এখন উপায় কি

দুলালী। কিসের উপায় মোতিয়া ?

মোতিয়া। যাঁহাকে মন দিলে, তাঁহাকে পাইবার উপায় ?

দুলালী। তাঁহাকে পাই আর না পাই, আমি তাঁহারই। "যো কুছ মুঝে সোহি হৈ"।

মোতিয়া। সে ত বুঝিলাম। তুমি ত বিকাইয়া গিয়াছ। উনি তোমাকে চাহিবেন কি ? ও যে বামণ, তুমি পাঠানের মেয়ে।

সহসা বজ্রপাতের শব্দ শুনিয়া নিদ্রিত বালক যেমন চমকিয়া উঠে, দুলালী, মোতিয়ার কথায় এমনই চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কাতরকণ্ঠে কহিলেন,

মোতি! আমি ত একথা ভাবি নাই। যাক্, মোতিয়া, ভাল বাসিয়াই আমার সুখ, আমি ত ভালবাসা পাইবার আশা করি নাই। তিনি আমাকে না চাহেন, না চাহিবেন, আমি তাঁহারই। তিনি ত আমাকে গ্রহণ করেন নাই, আমিই আমাকে তাঁহার পায় দিয়াছি। দুলালীর কপোলে দুই বিন্দু অশ্রু, মুক্তার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—

সে অশ্রু-বিন্দু দেখিয়া মোতিয়ার চক্ষুও জলপূর্ণ হইল। মোতিয়া, দুলালীর চিরসঙ্গিনী ও সমবয়স্কা।

মোতিয়া কহিল, সাজাদা, বেগম সাহেবাকে একথা বলিব কি? দুলালী, অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, বলিতে পারিস্।

মহানন্দার বক্ষে এক খানি নৌকা এই সময়ে পাল তুলিয়া উজান দিকে যাইতেছিল। মাঝি গাহিতেছিল—

"ননদিনী বলো নাগরে,
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক-সাগরে।"

গীতধ্বনি দুলালীর কাণে আসিয়া পৌঁছিল। কি ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে দুলালী বলিলেন, মোতিয়া, রোদ্ উঠেছে, চল্ ঘরে যাই।

৪

মন্ত্রণা।

সন্ধ্যার নমাজ পড়িয়া বাদশাহ সোলেমান অন্তঃপুরে আসিয়াছেন। বেগম সাহেবা আজ স্বহস্তে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। বেগমের আপ্যায়নের আড়ম্বর দেখিয়া বাদশাহ বুঝিলেন আজ তাঁহার বলিবার কিছু আছে। হাসিতে হাসিতে কহিলেন আজ যে গঙ্গায় জোয়ার দেখ্‌ছি?

বেগম। চাঁদ উঠেছে বলে।

বাদশাহ। চাঁদত রোজই উঠে, জোয়ার নিত্য হয় কৈ?

বেগম। তিথি চাই, শাহেন শা।

বাদশাহ। হাঁ আমিও সেই তিথির কথাই বল্‌ছি। কথা কি?

বেগম। কথা আর কি, গোস্তাকি মাফ্‌ চাই, কেবল পরের কথা নিয়া থাকিলে চলে না, ঘরও দেখিতে হয়। মেয়ের বিয়ে হবে না?

বাদশাহ। বিয়ে হবে না কেন পিয়ারী? তবে, দুলালীর মত মেয়ের তেমনি পাত্র চাই। গৌড়ে ত তেমন পাত্র দেখি না।

বেগম। আমি পাত্র পাইয়াছি। গোস্তাকি মাফ্‌ করিলে কহিতে সাহস করি।

বাদশাহ। ভাল কথা। তোমার মেয়ে, তুমিই যদি কাহাকেও সুপাত্র বলিয়া মনোনীত করিয়া থাক, সে ত উত্তম কথা। কে সে শুনিতে পারি কি?

বেগম। আপনার রাজধানীর ফৌজদার কালাচাঁদ রায়।

'বল কি ?' বলিয়া বাদশাহ কিছুকাল মৌনভাবে রহিলেন; অনেক ক্ষণ কি ভাবিলেন, তার পর বলিলেন, মহিষী, কালাচাঁদ বীর, বিশ্বাসী, স্বরূপ, সদ্বংশজাত; সে যে সুপাত্র,—দুলালীর উপযুক্ত বর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পিয়ারী, সে হিন্দু - ব্রাহ্মণ। পাঠানের মেয়েকে সে বিবাহ করিতে চাহিবে কি.? তাহাকে যে তা হ'লে মুসলমান হইতে হইবে।

বেগম কহিলেন, কেন পাঠান আর হিন্দুতে কি আর বিবাহ হয় নাই ?

হাসিতে হাসিতে বাদশাহ কহিলেন, হইয়াছে বটে, কিন্তু—

বেগম কহিলেন, বাদশাহ আর কিন্তু নাই। এ বিবাহ দিতেই হইবে। দুলালী তাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

"বল কি ?" বলিয়া বাদশাহ চমকিয়া উঠিলেন। এত দূর—

বেগম হাসিয়া বলিলেন,শাহেন শা যতদূর ভাবিয়াছেন,তত দূর নয়।

বাদশাহ। তবে কি ?

বেগম। রাজপুরীর প্রাচীরের পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া কালাচাঁদ রাজই মহানন্দায় স্নান করিতে যায়। দুলালী তাহাকে দেখিয়া ভুলিয়াছে। আর ভুলিয়াছে বলি কেন, সে তাহাকেই স্বামী করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে

বাদশাহ বিস্ময়ে কহিলেন, কে বলিল ? বেগম কহিলেন, দুলালীর সঙ্গিনী মোতিয়া বলিয়াছে।

বল কি ? পাঠানের মেয়ে হিন্দু দেখিয়া ভুলিল ?

কেন, শাহেন শা, হিন্দুর মেয়ে যদি পাঠান দেখিয়া ভুলিতে পারে, পাঠানের মেয়ে হিন্দু দেখিয়া ভুলিতে পারে না ? ভালবা-সার কি আইন আছে ?

বাদশাহ হাসিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাদশাহ গম্ভীরভাবে কহিলেন, দুলালীর এ মতের পরিবর্ত্তন করা যায় না ?

কখনই না। আমি সে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই শাহেন শা, মহানন্দাকে ফিরিয়া পর্ব্বতে যাইতে কহিলে যাইবে কি ? আর দুলালীও ত অপাত্রে আত্মসমর্পণ করে নাই।

বাদশাহ কহিলেন, তা ঠিক্। তবে জাতিটা—বেগম হাসিতে হাসিতে কহিলেন—এ ক্ষেত্রে জাতির বিচার কোথায় ? বাদশাহ কহিলেন, তা, মেয়ে না হয় জাতি না চাহিল, কিন্তু কালাচাঁদ ?

বেগম কহিলেন,তার আবার চাওয়া না চাওয়া কি ? বাদশাহের মেয়ে,—দুলালীর মতন মেয়ে—বিবাহ করিবে ইহা ত তাহার সৌভাগ্য। সম্পদ, সম্মান, রূপ, সকল প্রলোভনই ত ইহাতে আছে। তার পর হিসাব করিয়া দেখিলে ভাদুরী বংশের সহিত সম্পর্ক এই নূতন হইতেছে না।

হাসিতে হাসিতে বাদশাহ কহিলেন, ও হিসাব আনিবার বেলায়। দিবার বেলায় আমরা মানিলেও ও হিসাব হিন্দুরা মানে না। আমি বলি, দুলালী যেন কালাকে চায়, কালার মন কি জান ? কালা যদি দুলালীকে চাহিত, তবে কোনই গোল ছিল না।

বেগম কহিলেন, কালাচাঁদ দুলালীকে না দেখিবারই সম্ভব; দেখিলে কি হইত, বলিতে পারি না। তবে একথা ঠিক, যাহাকে আমি চাই, সে আমাকে না চাহিয়া কত দিন থাকিতে পারে? ভালবাসার কাছে সকলকেই হারিতে হয়। কালাচাঁদ না চাহিলেও চাহিবে, কেননা সে মানুষ, পাষাণ ত নয়। পাষাণ হইলেও প্রেমে গলে।

বাদশাহের মুখ গম্ভীর হইল, কি ভাবিতে লাগিলেন; অনেক ক্ষণ পরে কহিলেন, পিয়ারী বড়ই বিষম সমস্যা। কালাচাঁদ মুসলমান না হইলে এ বিবাহ হইতে পারে না, কেননা দুলালীও হিন্দু হইতে পারিবে না। যদি কালাচাঁদ ইচ্ছা করিয়া কল্‌মা না পড়ে, তাহা হইলে লোকে আমার নিন্দা করিবে, বলিবে, আমি জোর করিয়া নঞান রায়ের বেটার জাতি মারিলাম।

বেগম কহিলেন,—শাহেনশা, আমি সে কথা ভাবিয়াছি। আমি বলি, কালাচাঁদ কালাচাঁদই থাকুক, তাহাকে কামালবক্স বানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে দুলালীকে ধর্ম্ম-পত্নীরূপে গ্রহণ করুক। তা মৌলবীর মন্ত্র পড়িয়াই হউক বা বামণের মন্ত্র পড়িয়াই হউক। তাহাতে কোনই আপত্তি নাই।

বাদশাহ। একি অসম্ভব কথা!

বেগম। অসম্ভব নয়, শাহেনশা, গৌড়ের বাদশাহের হুকুমে দুলালীর বিবাহের মন্ত্র পড়াইবার পুরোহিতের অভাব হইবে না।

বাদশাহ। বিবাহ যেন হইল, ইহার পরিণাম কি হইবে?

বেগম। পরিণাম—কালাচাঁদ, গৌড়ে বাদশাহের জামাতা,

বীরজাওনে নঞান রায়ের বেটা কালাচাঁদ শর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে ভালই। অথবা যদি দুলালীকে সহ হিন্দু হয়, হিন্দুরা তাহাকে গ্রহণ করে, আপত্তি নাই। নহিলে, কালাচাঁদ ইচ্ছা করিয়া "[illegible]" বলিবে।

বাদশাহ। আর যদি দুলালীকে ফেলিয়া পলাইয়া যায়?

বেগম। অসম্ভব। এত ভালবাসা বিফল হয় না, শাহেনশা।

বাদশাহ। তবে এখন কর্ত্তব্য কি?

বেগম। কালাচাঁদকে ডাকিয়া বিবাহের প্রস্তাব করুন।

বাদশাহ। সে কি সম্মত হইবে?

বেগম। যাহাতে সম্মত হয়, তাহাই করিতে হইবে। নহিলে মেয়ে বাঁচিবে না।

৫

বন্দী।

অসময়ে বাদশাহের তলব পাইয়া ফৌজদার কালাচাঁদ রায় সসম্ভ্রমে রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। প্রহরিণী তাহাকে বাদশাহের শয়ন-প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া কালাচাঁদ শঙ্কিত ও বিস্মিত হইলেন।

ধীরপদে অগ্রসর হইয়া কালাচাঁদ বাদশাহকে কুর্ণিস করিলেন। বাদশাহ সোলেমান ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে সম্মুখের আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বলিলেন, অসময়ে আহ্বান করিয়াছি বলিয়া বিরক্ত হইয়াছ কি?

কালাচাঁদ পুনরায় কুর্ণিস করিয়া কহিলেন, হুজুর দুনিয়ার মালিক, তাবেদার সকল সময়েই বাদশাহের হুকুম তামিল করিতে প্রস্তুত আছে।

বাদশাহ কহিলেন। কালাচাঁদ, তুমি নঞান রায়ের পুত্র; নঞান রায় আমার হিতৈষী বন্ধু; এ সরকারের বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল, অবগত আছ কি?

ভূমিকা শুনিয়া কালাচাঁদ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বিনয়ের সহিত কহিলেন, স্বর্গীয় পিতৃদেবের উপর বাদশাহের অনুগ্রহের কথা বান্দা শুনিয়াছে।

বাদশাহ। তুমি নঞান রায়ের পুত্র বলিয়াই আমার স্নেহভাজন ও বিশ্বাসের পাত্র। তাই তোমাকে হাজারী মনসব ও গৌড়ের ফৌজদারী দিয়াছি। এই অল্প দিনেই তুমি স্বীয়

কার্য্যে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছ। বুঝিয়াছি, গৌড়ের ভার অপাত্রে দেওয়া হয় নাই।

আত্মপ্রশংসা শুনিয়া কালাচাঁদ লজ্জিত হইলেন। অধোমুখে বাদশাহকে সেলাম করিয়া কহিলেন, বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাবেদারের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?

বাদশাহ। আমি তোমার কার্য্যে এত তুষ্ট হইয়াছি যে, তোমাকে পুরস্কৃত না করিয়া পারি না। কালাচাঁদ তুমি সাজাদী দুলালীকে জান?

কাদাচাঁদ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ব্যাপার কি? প্রকাশ্যে কহিলেন, বান্দা সাজাদীর নাম শুনিয়াছে।

বাদশাহ। দুলালী বিবাহের যোগ্যা হইয়াছে। তাহার বিবাহের জন্য একটী সুপাত্রের আবশ্যক। আমি তোমাকেই দুলালীর বর মনোনীত করিয়াছি।

বাদশাহের এই অভাবনীয় প্রস্তাব শুনিয়া কালাচাঁদ চমকিত বিস্মিত ও স্তব্ধ হইলেন। একি স্বপ্ন দেখিতেছেন, না জাগরিত আছেন, কালাচাঁদের ভ্রম জন্মিল। কালাচাঁদ নীরব।

বাদশাহ ডাকিলেন, কালাচাঁদ, আমার কথার উত্তর দিতেছ না কেন?

বাদশাহের আহ্বানে কালাচাঁদ যেন জাগ্রত হইলেন। সসম্ভ্রমে যোড়হাত করিয়া কহিলেন, দুনিয়ার মালিক শাহেনশা, অধীনের উপর বাদশাহের অনুগ্রহ অসীম; কিন্তু হুকুম শুনিয়া ভৃত্য কিছু বুঝিতে পারিতেছে না।

বাদশাহ কহিলেন, কালাচাঁদ, রহস্য নহে, আমি সত্য কহি-তেছি। দুলালীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। তুমি রাজ-জামাতা হইবে।

কালাচাঁদ। হুজুর, গরীব, সাজাদীর পাণিগ্রহণের উপযুক্ত নহে। আমি হিন্দু— ব্রাহ্মণ।

বাদশাহ। তুমি একটাকিয়া ভাদুড়ী, বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়াই এ অনুগ্রহ করিতেছি।

কালাচাঁদ। আমার জাতি যাইবে।

বাদশাহ। তোমাকে মুসলমান হইতে বলি না। বিবাহ হিন্দুমতে হউক, আপত্তি নাই।

কালাচাঁদ। হিন্দুশাস্ত্র এমন বিবাহের বিধি দিবে না।

বাদশাহ। আমি বড় বড় পণ্ডিতদিগকে ভূমি ও অর্থ দিয়া বিধি গড়াইয়া লইব।

কালাচাঁদ। শাহেন শা, হিন্দুসমাজ তাহা মানিবে না।

বাদশাহ। অবশ্য মানিবে। আমি মানিতে বাধ্য করিব। যে মানিবে না, তাহাকে কল্‌মা পড়াইব। তুমি বালক, এখনও আমার কথার অর্থ বুঝিতেছ না; লাভালাভ হিসাব করিতেছ না।

কালাচাঁদ নিরুত্তর। জ্ঞাতি, বন্ধু, পরিবার, সমাজ ও জন্ম-ভূমির কথা মনে পড়িয়া কালাচাঁদের চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। হায়, তাহাকে কি এসকল ছাড়িতে হইবে! এই কি কর্ম্মসূত্র?

বাদশাহ কহিলেন,—কালাচাঁদ, দুলালীর প্রতিজ্ঞা, তোমার

গৃহিণী হইবে। খোদারও সেই ইচ্ছা। তোমাকে এ বিবাহ করিতেই হইবে।

কালাচাঁদ যোড়হাতে কহিলেন—শাহেনশা, গরীব ভৃত্যকে মাপ করুন, আমি জাতিধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিব না।

বাদশাহের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। গম্ভীরস্বরে কহিলেন, কালাচাঁদ, আমি কে জান ?

কালাচাঁদ। জানি ; হুজুর বাঙ্গালার বাদশাহ, ভৃত্যের জীবনের মালিক ; কিন্তু—

বাদশাহ—কিন্তু কি ? আমার আদেশ অবহেলা করিলে তোমার প্রাণদণ্ড করিব।

কালাচাঁদ। হুজুর প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, কিন্তু আমার ধর্ম্ম আমি রক্ষা করিব।

বাদশাহের ললাটের শিরা স্থূল হইয়া উঠিল। বিকৃতস্বরে ডাকিলেন,—মুজাফর। প্রাসাদের প্রহরীগণের সর্দ্দার খোজা মুজাফর আসিয়া সেলাম করিল।

বাদশাহ কহিলেন, এই বদ্‌বখ্‌তকে বন্দী কর। কাল ইহার শূল হইবে।

খোজা মুজাফর বিস্মিত হইয়া কহিল, ফৌজদার সাহেবকে ?

বাদশাহ চীৎকার করিয়া কহিলেন, হাঁ, এই বদ্‌বখ্‌তকে।

কালাচাঁদ বন্দী হইলেন।

কৃতজ্ঞতা।

কুকথা বাতাসের আগে ধায়। রাত্রির মধ্যেই নগরে প্রচারিত হইল, কল্য প্রাতঃকালে ফৌজদার কালাচাঁদ রায়ের শূল হইবে।

নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, কালাচাঁদ রায় বাদশাহকে মারিয়া সিংহাসন লইবার মন্ত্রণা করিতেছিল। কেহ বলিল, তাহা নয়, সাজাদীকে লইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল। যাহার যাহা মনে আসিল, সে তাহাই অন্যের নিকট বলিতে লাগিল।

অন্তঃপুরেও এসংবাদ পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না। যেখানে বিছানায় পড়িয়া দুলালী ফুঁফাইয়া ফুঁফাইয়া কাঁদিতেছিলেন, মোতিয়া সেখানে আসিল। আসিয়া কাছে বসিল। ধীরে ধীরে দুলালীর মুখখানি আঁচল দিয়া মুছাইয়া কহিল, সাজাদী আমি তখনই বলিয়াছিলাম, “করিলে কি”। এখন ত আর উপায় দেখি না।

কাঁদিতে কাঁদিতে দুলালী কহিলেন, হায়, মোতিয়া, আমিই তাঁহার বিনাশের কারণ হইলাম। শোন্ মোতিয়া, তাঁহার জন্য আমার লজ্জা, মান, ভয় নাই। আমি যদি বাবার কাছে যাইয়া তাহার জীবন-ভিক্ষা চাই?

মোতিয়া। সাজাদী, হাকিম নড়ে, তবু হুকুম নড়ে না। বিশেষ, বাদশাহ নিজে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ফৌজদার

সম্মত হন নাই। বাদশাহ, ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছেন। রায়, বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হইলে, বাদশাহের ক্রোধ থামিবে না, তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে না। তুমি বলিলেও না।

দুলালী। কিন্তু মোতিয়া, ইহাতে তাঁহার ত কোন দোষ দেখি না। বাবা, কেন বিবাহের প্রস্তাব করিলেন? আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাই বলিয়া তিনি কেন আপন জাতি-ধর্ম্ম হারাইবেন? বাবারই ত ভুল, মোতিয়া।

মোতিয়া। ভুল হইলেও সাজাদী হুকুম নড়িবে না। পাঠানের ক্রোধ।

দুলালী। সত্যই মোতিয়া, এ হতভাগীর জন্য তাঁহার জীবন যাইবে? রক্ষার কি কোন উপায় নাই? যত আস্‌রফি লাগে, মোতিয়া, ঐ সিন্দুক খুলিয়া লও, তাঁহাকে বাঁচাইতেই হইবে। প্রহরীদিগকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দাও। তার পর, আমার নসিবে যাহা থাকে, হইবে।

মোতিয়া। সাজাদী, বড় কঠিন কাজ। ধরা পড়িলে আমার গর্দ্দান যাইবে। তা, যাউক। তথাপি তোমার জন্য চেষ্টা করিব।

মোতিয়া সিন্ধুক খুলিয়া মোহরের থলিয়া লইয়া বাহিরে আসিল। প্রাসাদের প্রহরীগণের সর্দ্দার খোজা মুজাফরকে ডাকিয়া নিভৃত স্থানে লইয়া গেল। মুজাফর কহিল, এত রাত্রে আমাকে কেন ডাকিয়াছ?

মোতিয়া । আমি কে জান ?

মুজাফর । তুমি সাজাদীর বাঁদী, মোতিয়া ।

মোতিয়া । সাজাদী, আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন ।

মুজাফরের চক্ষু বিস্ফারিত হইল । মোতিয়ার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কেন, সাজাদীর কি হুকুম ?

মোতিয়া । ফৌজদার কালাচাঁদ রায় বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাকে এখনই মুক্ত করিয়া দিতে হইবে ।

মুজাফর । অসম্ভব কথা । বাদশাহের কি হুকুম শুনিয়াছ ? কাল্ প্রাতে তাঁহার শূল হইবে ।

মোতিয়া । বাদশাহের হুকুম জানি । সেই জন্যই সাজাদী আমাকে পাঠাইয়াছেন । শুন মুজাফর, যত আস্‌রফি লাগে লও, ফৌজদারকে এখনই মুক্ত করিতে হইবে ।

আস্‌রফির কথায় মুজাফরের তীব্র চক্ষু স্নিগ্ধ হইয়া আসিল । কহিল, মোতিয়া, অসম্ভব কথা । আমার গর্দ্দান যাইবে ।

মোতিয়া । অসম্ভব নয় । যত আস্‌রফি লাগে, প্রহরীদিকে দেও । দুর্গের বাহিরে ঘোড়া প্রস্তুত রাখ । ফৌজদার রাত্রির মধ্যেই গৌড় ছাড়িয়া চলিয়া যাউন । প্রহরীরা প্রাতঃকালে বলিবে, হিন্দুবামণ যাদু জানে, মন্ত্রবলে শূন্যে উড়িয়া পালাইয়াছে ।

মুজাফর । বিষম কথা । বাদশাহ তাহা মানিবেন কি ?

মোতিয়া । কেহ বলিবে, কেহ সাক্ষ্য দিবে, না মানিয়া বাদশাহ করিবেন কি ?

মুজাফর। না মোতিয়া, আমার এ সাহস নাই। সাজাদীর কথা রাখিতে গিয়া প্রাণের মায়া ছাড়িতে পারি না।

আস্‌রফিগুলি আঁচলে ঢালিয়া মোতিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল, সাজাদী বাদ্‌শাহের কত সোহাগের জান? যে প্রাণের মায়ায় আজ সাজাদীর হুকুম রাখিতে পার না, কাল সাজাদীর এক কথায় সে প্রাণ যাইতে পারে। মুজাফর, আস্‌রফি গণিয়া লও, সাজাদীর হুকুম পালন কর।

মুজাফর দেখিল, উভয়তঃই প্রাণের দায়, কিন্তু এদিকে সম্মুখে আঁচলভরা মোহর চক্‌চক্ করিতেছে, মুজাফর লোভ সামলাইতে পারিল না, মোহর গণিয়া লইল। মোতিয়াকে কহিল, তুমি অপেক্ষা কর, আমি বন্দোবস্ত করিয়া আসি। মনে মনে ভাবিল, না হয় রাজ্য ছাড়িয়া যাইব। পলাইলে কে ধরিবে?

কতক্ষণ পরে মুজাফর আসিয়া মোতিয়াকে লইয়া কারাগারের যে প্রকোষ্ঠে কালাচাঁদ রায় বন্দী ছিলেন, তাহার সম্মুখে গেল। মুজাফর নিদ্রালু প্রহরীর কাণে কাণে কি বলিল, প্রহরী প্রকোষ্ঠের তালা খুলিয়া দিল। প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মোতিয়া ডাকিল, ফৌজদার সাহেব—রায় মহাশয়। সহসা স্ত্রীকণ্ঠের আহ্বানে কালাচাঁদ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কে তুমি ডাকিতেছ? মোতিয়া কহিল, দ্বারের নিকটে আসুন। আমি সাজাদী দুলালীর বাঁদী। কালাচাঁদ বিরক্তির সহিত কহিলেন, তুমি আবার কোন্ হুকুম লইয়া আসিয়াছ? জীবন্ত কবরের

াদেশ কি ?—তা হউক, আমার ত সবই সমান। বল, কি লিতে চাও। কালাচাঁদ অগ্রসর হইলেন।

মোতিয়া কহিল,—রায় মহাশয়, অধিক কথা বলিবার স্থান ও ময় এ নহে। কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত, আপনি এখনই এখান ইতে প্রস্থান করুন। দুর্গের বাহিরে অশ্ব সজ্জিত আছে।

কালাচাঁদ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন, প্রহরীরা আমাকে রিবে না ?

মোতিয়া কহিল,—ধরা দূরে থাকুক, কেহ আপনাকে একটি থাও জিজ্ঞাসা করিবে না। আপনি শীঘ্র বাহির হউন।

কালাচাঁদ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, আমি রহস্য বুঝিতে পারিতেছি না। এ বন্দোবস্ত কে করিল ?

মোতিয়া। সাজাদীর আদেশে আমি করিয়াছি।

কালাচাঁদ। সাজাদীকে বলিও তাঁহার এই অপ্রার্থিত অনু-হের জন্য আমি কৃতজ্ঞ হইলাম। কিন্তু নঞান রায়ের পুত্র, শাহের বিশ্বস্ত ভৃত্য, পলায়ন করিতে জানে না। আমার ণ যাইতে পারে, কিন্তু চোরের মত পলায়ন করিতে পারিব না।

মোতিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিয়া গেল।

তিয়া চলিয়া গেলে, কালাচাঁদ ভাবিলেন, একি ? আমার ন রক্ষার জন্য সাজাদীর এত চেষ্টা কেন ? তবে কি সাজাদী ই আমাকে ভালবাসে ? কই, আমি ত কখনও সাজাদীকে দেখি ই, সাজাদী কি আমাকে দেখিয়াছে ? না দেখিলেই বা কিরূপে বাসিল ? ...দশাহ বলিয়াছেন, সাজাদী আমাকে স্বামী করিবে

বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এ কি রহস্য ? গুরুদেব, তুমি কোথা প্রভু ! আমি কোন্ কর্ম্মসূত্রে আকৃষ্ট হইতেছি, কে বলিবে ?

সাজাদী, তুমি কেমন দেখি নাই। কিন্তু বুঝিতেছি, তোমা হৃদয় আছে, হৃদয়ে প্রেম আছে। কিন্তু হায় রাজকুমারী, তোমা সে প্রেম অপাত্রে অর্পণ করিয়াছ। তোমার ভালবাসা আমা পক্ষে বিদ্যুৎ-মালা তুল্য, উহার স্পর্শে আমার মৃত্যু।

সহসা তাহার মনে হইল, বাবাজী বলিয়াছেন, প্রেম অমৃত প্রেম আনন্দ। প্রেমে জাতির বিচার নাই। কিন্তু সমাজ তাহ মানিবে কেন ? শাস্ত্র কি স্বার্থ নিঃস্বার্থের বিচার করিবে ? শাস্ত্র ও সমাজ বাহির লইয়া, হৃদয়ের কথা সে ক্ষেত্রে বিকাইবে কি ?

এমন সময়ে নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাজপথে কে গাহিতে লাগিল ঃ—

"পিরীতি বলিয়া তিনটী আখর
এ তিন ভুবন মাঝে,
যাহারে পশিল, সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে।"

কালাচাঁদ ভাবমুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবকবির এই নিষ্কাম কাম-গাথা শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল।

৭

স্বপ্ন।

মোতিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সাজাদী সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

দুলালীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কাতরকণ্ঠে কহিলেন—মোতিয়া কি হইয়াছে বল্।

মোতিয়া কহিল, - সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছিলাম, খোজা মুজাফর দুর্গের বাহিরে অশ্ব রাখিয়াছিল, কিন্তু তিনি পলায়ন করিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, সাজাদীকে বলিও, তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য আমি কৃতজ্ঞ হইলাম, কিন্তু নঞান রায়ের পুত্র পলায়ন করিতে জানে না। আমার প্রাণ যাউক, চোরের মত পলায়ন করিতে পারিব না।

শুনিয়া, দুলালীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মুখে বলিলেন, হাঁ পুরুষের মত কথা বটে। মোতিয়া আমরাই ভুল বুঝিয়াছি। মনে মনে কহিলেন, প্রভু, তুমি এমনি পুরুষোত্তম বলিয়াই তোমার পায় বিকাইয়াছি।

মোতিয়া কহিল,—সাজাদী এখন উপায় ?

দুলালী আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল। কিছুকাল উভয়েই নির্বাক্।

মোতিয়া ভাবিল, বঁধুর পীরিতি এমনই। দুলালী ভাবিলেন, আমি ভালবাসিয়াছি বলিয়া তাঁহার প্রাণ গেল, আমার মত হত-ভাগী আর কে আছে ? একথা শুনিবার আগে আমার প্রাণ

গেলনা কেন ? তিনি কারাগারে, আর আমি প্রাসাদে রহিয়াছি ? আমাকে ধিক্। দুলালী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উন্মত্তার ন্যায় উগ্রস্বরে কহিলেন, মোতিয়া, তুই এখন যা, কাল যখন তাঁহাকে কারাগার হইতে বাহির করে, আমাকে তখনই সংবাদ দিস্।

মোতিয়া চলিয়া গেলে, মনে মনে কহিল, আর সে সংবাদ লইয়া কি হইবে ?

দুলালী মেজেতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার তন্দ্রাবেশ হইল। দুলালী স্বপ্ন দেখিলেন—খরস্রোতা বিশাল নদী, উহার স্বচ্ছ শুভ্র সলিলরাশি শত শত আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া ভীমবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তাল-তরঙ্গমালা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। সেই তরঙ্গতাড়িত হইয়া দুলালী ও কালাচাঁদ ভাসিয়া চলিয়াছেন। দুলালী ভীতচিত্তে কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছেন প্রভো, স্বামিন্, আমায় ধর, কালাচাঁদ সে ডাক শুনিতেছেন না। তরঙ্গ, তাহাকে দূরে লইয়া যাইতেছে। এমন সময়ে এক আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়া কালাচাঁদ দুলালীর নিকটে আসিয়া পড়িলেন। দুলালী অমনি তাঁহাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিলেন। আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া দুই জনে ভাসিয়া চলিলেন। কালাচাঁদ কহিলেন, প্রিয়ে, দুলালী, মরণেই আনন্দ। দুলালী কহিলেন, প্রভু, জীবনেও আনন্দ আছে। এমন সময় দিঙ্মণ্ডল অন্ধকার করিয়া প্রবল ঝড় আসিল। তরঙ্গের প্রচণ্ড তাড়নে দুলালীর বাহুবন্ধনচ্যুত হইয়া কালাচাঁদ কোথায় ছুটিয়া গেলেন্। দুলালী চীৎকার

করিয়া উঠিলেন। উচ্চস্বরে ডাকিলেন, প্রভো, স্বামিন্,—সেই ঘোর অন্ধকারে কেহ উত্তর দিল না। কেবল তরঙ্গগুলি ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিল।

সেই ঘোর অন্ধকারে দুলালী একা ভাসিয়া চলিয়াছেন, স্বামিন্ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, হস্ত অবশ হইয়াছে, চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে, কিন্তু কোথায় সেই প্রিয়তম। এমন সময়ে সেই ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া আকাশে এক দিব্যজ্যোতি বিভাসিত হইল। এক দীর্ঘায়ত গৌরকান্ত মণ্ডিতশীর্ষ পুরুষ সেই জ্যোতি হইতে তরঙ্গের উপরে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার স্নিগ্ধদৃষ্টিতে উন্মত্ত তরঙ্গগুলি শান্ত হইল। মধুর আহ্বানে দুলালীর নির্জ্জীব প্রাণে চেতনা ফিরিয়া আসিল। জ্যোতিপুরুষ কহিলেন,—মা, এ ব্রত এইরূপেই উদ্‌যাপন করিতে হয়; সর্ব্বস্ব—কায়, প্রাণ, না দিলে এ ব্রতের ফল লাভ হয় না। তোমার ব্রত সিদ্ধি হইয়াছে। এই কালাচাঁদ।

জ্যোতিঃপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

দুলালী চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে চিরবাঞ্ছিত মূর্ত্তি। আবেগভরে যেমন আলিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত বাড়াইয়াছেন, অমনি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

এমন সময়ে মোতিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কারাগৃহের নিকট গোলমাল শুনা যাইতেছে, বুঝি তাঁহাকে লইয়া যায়।

দুলালী উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

মিলন।

রাত্রি প্রভাত হইলে কারাধ্যক্ষ হোসেন খাঁ বাদশাহের হুকুম তামিল করিবার জন্য আসিলেন। প্রহরীরা বন্দী কালাচাঁদকে কারাগৃহের প্রাঙ্গণে বাহির করিয়া আনিল।

ফৌজদারের শূল হইবে শুনিয়া, নগরের লোক দ্রুতপদে কারাগৃহের দিকে যাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তে কারাপ্রাঙ্গণ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল।

প্রহরি-বেষ্টিত বদ্ধহস্ত কালাচাঁদ অধোমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময়ে সকলে দেখিল, বিদ্যুল্লতার ন্যায় আলুলায়িতকুন্তলা এক তরুণী উন্মাদিনীর মত সেই দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে।

যাহারা চিনিত, তাহারা সাজাদী সাজাদী বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যাহারা চিনিত না, তাহারা ভাবিল, স্বর্গের দেবী।

তরুণী উন্মাদিনার মত বন্দীর দিকে আসিতে লাগিলেন। সম্ভ্রমে লোকে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। প্রহরীরা বন্দীকে ছাড়িয়া দূরে গেল।

উন্মাদিনী, কাতরকণ্ঠে "প্রভু, স্বামিন্" বলিতে বলিতে বন্দীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

কালাচাঁদের হস্তের বন্ধন খুলিয়া গেল; হৃদয় উথলিয়া উঠিল, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। প্রেমের নিকট লজ্জা, মান, ভয়, এই তিন পরাজিত হইল। অজ্ঞাতসারে কালাচাঁদের মুক্তহস্ত তরুণীকে আলিঙ্গন করিল।

গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কালাচাঁদ কহিলেন,—প্রিয়ে, সাজাদী, এ করিলে কি ? আমি বন্দী, আমার শূলের হুকুম হইয়াছে। এখনই আমার প্রাণ যাইবে।

প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুইটির কাতর দৃষ্টিতে প্রাণের অনন্ত বেদনা জানাইয়া উন্মাদিনী কহিল, স্বামিন্, দাসীর প্রাণ থাকিতে এই বাহুবন্ধন হইতে কেহ তোমাকে নিতে পারিবে না। আমি প্রাণ দিয়া তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিব। আগে দাসীর প্রাণ যাউক।

যাহারা শূল দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। সেই মুক্ত প্রাঙ্গনে অগণ্যসংখ্যক লোক অবাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কারাধ্যক্ষ হোসেন খাঁ ফাঁফরে পড়িলেন। এই অভাবনীয় ঘটনা তাহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিল। কিছুকাল বিস্ময়-বিমুগ্ধের ন্যায় রহিয়া, তিনি বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

সংবাদ পাইয়া, বাদশাহ সোলেমান বিস্ময়ে,ক্রোধে ও লজ্জায় স্তম্ভিত হইলেন। কন্যার উপর তাঁহার একবার ক্রোধ আবার দয়া হইতে লাগিল। উন্মুক্ত তরবারী হস্তে বাদশাহ কারাগৃহের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভৈরব মূর্ত্তি দেখিয়া, জনসঙ্ঘ প্রমাদ গণিল।

তখনও প্রেমিকযুগল তেমনই আলিঙ্গনবদ্ধ রহিয়াছে। বাদশাহকে দেখিয়া, তাঁহাদের বাহুবন্ধন শিথিল হইল। লজ্জানত

মুখী দুলালী কালাচাঁদকে দক্ষিণ বাহুতে দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া, তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

এ মিলন-মূর্ত্তি দেখিয়া বাদশাহের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। বাদশাহ ডাকিলেন, কালাচাঁদ—

ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে কালাচাঁদ কহিলেন, শাহেনশা, আমি সাজাদীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

বাদশাহের মুখ প্রফুল্ল হইল। কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।

নহবতের সানাইয়ে ভঁয়েরো বাজিতে লাগিল। রাজপথে ভিখারী গাইতেছিল—

"সেই ত পরাণ নাথকে পাইনু,
যার লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু।"

প্রেমিক যুগলের কর্ণে সে গীত অমৃত বর্ষণ করিল।

৯

সামাজিক বৈঠক।

দুই দিনের মধ্যেই একথা দেশে প্রচার হইয়া গেল যে, কালাচাঁদ রায় গৌড়ের বাদশাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন মুসলমান হইয়াছেন।

বীরজাওনেও একথা প্রচারিত হইল। কালাচাঁদের মাতা শুনিলেন, ছেলের জাতি গিয়াছে। কিন্তু পুত্রের চরিত্রের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল, তিনি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না।

প্রতিবেশী নবকৃষ্ণ লাহিড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া কালাচাঁদ রায়ের জাতিপাতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কালাচাঁদের জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয়, সকলেই সেই আলোচনায় যোগ দিল। মামলা সঙ্গীন, গ্রাম্য হাইকোর্টের পূর্ণাধিবেশন।

হরিশ তর্কালঙ্কার ন্যায়ের পণ্ডিত, নস্যের টিপ্ লইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, এমন যে হইবে, তাহা ত আগেই জানি। শাস্ত্রেই আছে,—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" কি বল সিদ্ধান্ত খুড়া?

সিদ্ধান্ত খুড়া স্মার্ত্ত; বয়স একটু বেশী, স্মৃতির সব বিস্মৃতিতে গত হইয়া, এখন কেবল অশৌচের ব্যবস্থাটুকু মনে আছে। কাশিতে কাশিতে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ঠিক্ বলেছ বাবাজী, শূলপাণি লিখিয়াছেন—"লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া"।

গ্রামবৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, কলির পূর্ণপ্রভাব,

আরও না জানি কত দেখিতে হইবে। আর বুঝি ধর্ম্ম থাকে না, কালাচাঁদ, নঞান রায়ের বেটা কালাচাঁদ, সে-ই এই করিল? এখন উপায়?

উপায় নির্ণয় করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সকলেই একবাক্যে স্থির করিলেন, কালাচাঁদের সহিত সম্বন্ধ সম্পর্ক দূরে থাকুক্, তাহার সহিত সম্ভাষণও কেহ করিবে না। তাহার বাটীতে কেহ যাইবে না। কালাচাঁদ ফুলবেঞ্চের বিচারে এক-ঘরে হইলেন।

নবীন রায়, কালাচাঁদের জ্ঞাতি-ভ্রাতা, সমবয়স্ক। উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা ছিল। গ্রাম্য সামাজিকগণের সিদ্ধান্তে তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি কহিলেন, মহাশয়েরা ত কালা-চাঁদের জাতিপাত স্থির করিয়া, তাহাকে 'একঘরে' করিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে যে বাদশাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, মুসলমান হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কেহ দিতে পারেন কি?

"ইহার আবার প্রমাণ কি?" বলিয়া সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল। সিদ্ধান্ত খুড়া কহিলেন, বাপু হে, তুমি দেখিতেছি হাটের দুয়ারে কপাট দিতে আসিয়াছ। তোমার এ দুর্ম্মতি কেন?

তর্কালঙ্কার কহিলেন,—"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং" শাস্ত্রে সব আছে, বাবাজী; কোন্ প্রমাণ চাও?

নবীন রায় কহিলেন,—আমি শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতেছি না। কিন্তু সবিশেষ না জানিয়া লোকের কথায় এরূপ করা সঙ্গত হইতেছে কি?

তর্কালঙ্কার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" লোকের কথা মিথ্যা হয় না; শাস্ত্রে শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়াছে। তুমি দেখ্‌ছি শাস্ত্র উল্টাইতে চাহ।

বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন,—আমাদের তিন কাল গিয়াছে, এক কাল বাকী; এখন আর আমরা ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে পারি না। তুমি কি প্রমাণের কথা বলিতেছ? ইহার আবার প্রমাণ? প্রমাণের প্রয়োজন থাকে, তুমি খুঁজিতে পার। আমাদের সে জন্য শিরোবেদনা হয় নাই।

শঙ্কর ভট্টাচার্য্য কহিলেন, উনি দেখ্‌ছি ঐ দলের। বোধ হয়, গৌড়ে উহারও একটা সাদির কথা হইয়াছে। নবীনকেও 'একঘরে' করিতে হইবে।

উচিত কথা কহিতে গিয়া নবীন রায়ও সম্ভাবিত সাদির হেতুতে একঘরে হইলেন। স্মৃতি ও ন্যায়ের অকাট্ট বিচার শেষ হইল, সকলে ঘরে গেলেন।

নবীন ক্রুদ্ধ, বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন, পথে দেখিলেন, কালাচাঁদের মাতা গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী যাইতেছেন। নবীন ডাকিলেন, খুড়ী মা—

কালাচাঁদের মাতা, নবীনের আহ্বানে ফিরিলেন। নবীনকে কহিলেন, বাছা এসব কি শুনি? ঘাটে পথে কেবল একই কথা; কালাচাঁদ নাকি বাদশাহের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে। তা, সে যদি ভাল বুঝিয়া করিয়া থাকে, বেশ করিয়াছে; লোকের এত মাথা ব্যাথা কেন? আমাকে ত লোকে পাগল করিয়া তুলিল।

নবীন কহিলেন, খুড়ী মা, কালাচাঁদ ত বালক নয়, মাতাল নয়, দুশ্চরিত্রও নয়, মূর্খ বা অক্ষমও নয়। সে যাহা করিবে, তাহা বুঝিয়াই করিবে। সে জন্য ভাবনা কি?

না বাবা, আমি সে জন্য ভাবি না। অদৃষ্টের লিপি খণ্ডাইবার সাধ্য কি? তার অদৃষ্টে যদি ইহাই লেখা থাকে, আমি দুঃখ বোধ করিব কেন? আর দুঃখের বিষয়ই বা কি? কালা যদি বাদশাহের মেয়েকে আপন ইচ্ছায় বিবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সুখীই হইব। বাদশাহের বেটীকে বধূ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব।

নবীন কহিলেন,—খুড়ীমা, আজ গ্রামের সকলে মিলিয়া কালাচাঁদকে 'একঘরে' করিয়াছে। আমাকেও 'একঘরে' করিয়াছে।

কেন তোমার অপরাধ কি? কালাচাঁদই না হয় বাদশাহের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে।

নবীন কহিলেন,—আমি সামাজিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে কহিয়াছিলাম, কালাচাঁদ যে বাদশাহের মেয়ে বিবাহ করিয়াছে, একথা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। কেবল লোকের শুনা কথা শুনিয়া, তাহাকে 'একঘরে' করা সঙ্গত নহে। ইহাতেই তাহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, আমি কালাচাঁদের দলের লোক। গৌড়ে আমারও একটা সাদির বন্দোবস্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমারও জাতি গেল। খুড়ী মা, এ দেশের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এইরূপ।

কেন বাবা, শাস্ত্রে কি এমন অন্যায় লিখে?

না, খুড়ী মা, শাস্ত্রে অন্যায় লিখে না, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রীরা শাস্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাই করেন।

তা, লোকে মানে কেন ?

নবীন কহিলেন,—খুড়ী মা, লোকে ত শাস্ত্রও চায়না, ধর্ম্মও চায় না, চায় হুজুগ। একটা হইলেই হইল। দেখিবেন, কালাচাঁদ বাটী আসিলে, এই শাস্ত্রী ও সামাজিকেরাই উল্টা গীত গাহিবেন। কালাচাঁদকে বাড়ী আনিতে হইতেছে।

বৃদ্ধা কহিলেন,—আচ্ছা, কালই মোহনসিংহকে গৌড়ে পাঠাইব।

১০

ঘরের কথা।

কালাচাঁদ বাদশাহের জামাতা হইয়া প্রধান সেনাপতির পদ পাইয়াছেন। এখন আর তিনি গৌড়ের ফৌজদার নহেন।

রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন এক বৃহৎ অট্টালিকায় তিনি বাদশাহ-নন্দিনীকে লইয়া বাস করেন। সে অট্টালিকায় দাসদাসী, পাচক-প্রহরী, সবই হিন্দু। কালাচাঁদ এখনও পূর্ব্বের মত মহানন্দায় প্রাতঃস্নান করেন, স্নানান্তে তেমনই স্বর্ণকোশা হাতে লইয়া "মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি" গাহিতে গাহিতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার গৌরকান্ত বক্ষোদেশে শুভ্র উপবীত তেমনই প্রলম্বিত আছে।

এক দিন প্রাতঃস্নান করিয়া কালাচাঁদ প্রাসাদে আসিয়া দেখিলেন, বাটীর দ্বাররক্ষক মোহনসিংহ মাতাঠাকুরাণীর পত্র লইয়া আসিয়াছে। মোহনের হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ করিয়া, কালাচাঁদ অগ্রে উহা মস্তকে স্থাপন করিলেন, তার পর পাঠ করিয়া মর্ম্ম অবগত হইলেন। কালাচাঁদের মুখ গম্ভীর হইল। উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন, মোহন, মা কিছু বলিয়াছেন?

মোহন। তিনি আপনাকে দেখিতে চাহেন। তার অধিক কিছু বলেন নাই।

কালাচাঁদ। আমার বিবাহের কথা মা শুনিয়াছেন? গ্রামে এ কথা লইয়া কিছু আলোচনা হইয়াছে?

মোহন। মা ঠাকুরাণী বিবাহের কথা শুনিয়াছেন। গ্রামের

সকলে মিলিয়া আপনাকে ও নবীনরায়কে 'একঘরে' করিয়াছে। ঘাটে পথে এই বিবাহের কথা লইয়া আলোচনা হইতেছে।

কালাচাঁদ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, নবীনকে কেন 'একঘরে' করিল? আমি না হয় বাদশাহের বেটীকে বিবাহ করিয়াছি; নবীনের অপরাধ?

মোহন। নবীনরায় মহাশয় আপনার পক্ষে কথা বলিয়াছিলেন, এই অপরাধ।

কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা, বেশ। বিবাহের কথা শুনিয়া মা কি বলিয়াছেন?

মোহন। তিনি বলিয়াছেন, কালাচাঁদ অবোধ নহে, না বুঝিয়া কিছু করে নাই। সে যাহা করিয়া[illegible]

১১

স্মৃতির ব্যবস্থা।

এক দিন সকলে দেখিল, শত অশ্বারোহিবেষ্টিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া, গৌড়ের বাদশাহের প্রধান সেনাপতি কালাচাঁদ রায় স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কালাচাঁদের এই অভ্যুদয় দেখিয়া,যেমন এক দিকে অনেকের রসনা সংযত হইল, অনেক রক্ষণশীল সহসা অত্যুদারমতাবলম্বী হইলেন, অন্য দিকে অনেকে আবার সংকল্প দৃঢ়তর করিলেন। কালাচাঁদের এত উন্নতি না হইলে, হয় ত তাহাদের এত দৃঢ় সংকল্পের ইচ্ছাও হইত না।

কালাচাঁদ বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন। অন্তঃপুরে যাইয়া, ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া, মাতার পদধূলি লইলেন। মা কহিলেন, বাবা, বৌ সঙ্গে আন নাই? আমাকে বৌ দেখাইলে না? কালাচাঁদ অধোমুখ হইয়া কহিলেন, মা, ততদূর সাহস করি নাই।

কেন বাবা? আমাদের পুরাণ ইতিহাসে এইরূপ বিবাহে দোষ ধরে না। স্বয়ং ভগবান্ নরক অসুরের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। জাম্ববতী ভল্লুকের কন্যা। ব্যাসদেবের মাতা জেলেনী। শুনিয়াছি, শাস্ত্রে নাকি রাজাকে দেবতা বলে। রাজার আবার জাতি কি? এ বিবাহ গর্হিত হয় নাই।

কালাচাঁদের মুখ উজ্জ্বল হইল। মায়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, মা শুনিলাম, আমাকে নাকি সকলে একঘরে করেছে?

হঁা বাবা, তাই শুনিয়াছি। কেবল তোমাকে কেন, নবীনকেও।

এদেশের বিচার মন্দ নয়, বলিয়া কালাচাঁদ হাসিতে লাগিলেন।

মা কহিলেন, বাবা দশ জনে অনুরোধ করিলে, একটা প্রায়শ্চিত্ত করিও। দশের মন রাখিতে হয়।

কালাচাঁদ কহিলেন, মা, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আমি পাপ না করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হইব। কিন্তু তার পর কি হইবে মা?

মা বলিলেন—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। পরের ব্যবস্থা পরে করিয়া লইও।

আহারাদির পর কালাচাঁদ বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। এমন সময় নবীন রায় আসিলেন। হাসিয়া কালাচাঁদ কহিলেন, এস ভাই, এস, দুই 'একঘরে' এক ঘরে বসি। নবীন উপবেশন করিয়া একথা ওকথার পর বাদশাহ-কুমারীর কথা উঠাইলেন। নবীন কালাচাঁদের সমবয়স্ক।

কালাচাঁদ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে সে কাহিনী অকপটে আদ্যন্ত নবীনের নিকট বলিলেন। নবীনের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

তাঁহাদের বিশ্রম্ভালাপ হইতেছে, এমন সময় তর্কালঙ্কার ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই তর্কালঙ্কারই গ্রাম্য সভার প্রধান বক্তা ছিলেন।

তর্কালঙ্কার আসিলে, কালাচাঁদ দুইটি বাদশাহী রজতখণ্ড দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তর্কালঙ্কার প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলেন, বাবাজীর জয় হউক। তর্কালঙ্কারের মুখচ্ছবি আজ বড়ই প্রসন্ন।

কালাচাঁদ কহিলেন, আমার বিবাহের কথা লইয়া শুনিলাম, গ্রামে খুব আন্দোলন হইতেছে।

নস্যের টিপ লইয়া হাসিতে হাসিতে তর্কালঙ্কার কহিলেন, শাস্ত্রেই আছে ঃ—

"যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ।" ভগবান্ রামচন্দ্রকেও লোকগঞ্জনার দায়ে পড়িতে হইয়াছিল। এসব উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কালাচাঁদ—এরূপ বিবাহ কি নিন্দনীয়?

তর্কালঙ্কার—কে বলে? কি হেতুতে নিন্দনীয় হইবে? অসবর্ণ বিবাহ চিরদিনই দ্বিজ জাতির ছিল।

কালাচাঁদ—শাস্ত্রে এরূপ বিবাহের বিধি আছে কি?

তর্কালঙ্কার—থাকিবে না কেন? "অনন্তশাস্ত্রং" নাই কি? বিধি আছে, উত্তম দৃষ্টান্ত আছে। ব্যাস-বশিষ্ঠ নিজে এরূপ করিয়াছেন। আর কি চাও?

কালাচাঁদ—আপনি যদি ব্যবস্থা দিতে পারেন, আমি উপযুক্ত প্রণামী এখনি দিব।

তর্কলঙ্কার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, এখনই কাগজ কলম আন, লিখিয়া দিতেছি। আর পুঁথি দেখিতে হইবে না। তুমি

আসিয়া যে ব্যবস্থা চাহিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া, সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।

কাগজ কলম আনীত হইল। তর্কালঙ্কার ব্যবস্থা লিখিলেন।

হাসিতে হাসিতে নবীন রায় কহিলেন, আপনিই না সেদিন বলিয়াছিলেন "শব্দ ব্রহ্ম"।

তর্কালঙ্কার হাসিয়া কহিলেন, তা বাবাজী, ভুল বলি নাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"ও বলে, সকলই ব্রহ্ম ; এ তর্কে জাতি টিকে কই ? শাস্ত্র মিথ্যা নয়।

বিশেষ মনু বলিয়াছেন—"মহতী দেবতা হেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"। রাজা—নরদেবতা, তার জাতি নাই। বাদশাহের কন্যা বিবাহ করিলে জাতি যাইতে পারে না। কোন পাপই হয় না।

কালাচাঁদ ও নবীন হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীক্ষেত্রে।

তর্কালঙ্কার ব্যবস্থা দিলেও কালাচাঁদকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। কালাচাঁদ মায়ের আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

যে অবস্থায় পড়িয়া তাহাকে এই ঘটনায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে—বাদশাহ-কন্যাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে, কিছু মাত্র গোপন না করিয়া, তাহা সকলকে বলিলেন। সহৃদয়েরা সে সে কাহিনী শুনিয়া বিগলিত হইলেন। যাহারা হৃদয়হীন, তাহারা 'পীরিতের দায়' বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা দুর্গা দুর্গা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন।

প্রায়শ্চিত্তে কোন ফল হইল না। কালাচাঁদ সমাজে গৃহীত হইতে পারিলেন না। যাহারা প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারে উপস্থিত ছিল, তাহারা আবার নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিল।

কালাচাঁদের মাতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, বধূর জন্য আপনার অলঙ্কারগুলি দিয়া বৃন্দাবনে গেলেন। কালাচাঁদকে কহিলেন, বাবা, আমার ভোগের সমাপ্তি হইয়াছে। তোমাকে ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। আমার আর সংসারে চাহিবার কিছু নাই। এক্ষণে বৃন্দাবনের ধূলিতে এ শরীর মিশাইতে পারিলেই, ইহজীবনের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়।

কালাচাঁদ অশ্রুপূর্ণনেত্রে মাতাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া গৃহে ফিরিলেন। তর্কালঙ্কারকে পাঠাইয়া আর এক বার জ্ঞাতি-বন্ধু-

দিগের অভিমত জানিলেন। আজন্মপোষিত সংসার ও মৈত্রীবন্ধন বশতঃ কালাচাঁদ সকল লাঞ্ছনা সহিতে লাগিলেন।

সমাজের নেতা শাস্ত্রী অশাস্ত্রীর দল বলিলেন, কালাচাঁদ শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া পুরুষোত্তমের প্রত্যাদেশ লইলে,তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। নতুবা সমাজে তাহার স্থান নাই। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কোন স্মৃতিতে নাই।

শ্রীক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান্ দারুবিগ্রহরূপে বর্ত্তমান। সে ক্ষেত্রে উচ্চ নীচ নাই, জাতিবর্ণের বিচার নাই। নীলাচল, পাপীও পুণ্যবানের চরম আশ্রয়। কালাচাঁদ শ্রীক্ষেত্রে গেলেন।

সামাজিকগণের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও কপটতা, শাস্ত্রে অনাস্থা, অহেতুক নির্য্যাতনেচ্ছা প্রভৃতি অসদ্ব্যবহারে কালাচাঁদের মনে দারুণ ক্রোধ, বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মিয়াছিল। এক এক বার তাঁহার মনে হইতেছিল, গৌড়ের অশ্বারোহীদিগকে হুকুম দিয়া এই বাগাড়ম্বর ও কপটতার উপযুক্ত প্রতিশোধ দেই। তখনই আবার মনে হইতেছিল, ইহারা তাহারই আত্মীয় স্বজন। ইহাদিগকে মনে মনে ঘৃণা করিলেও, ইহাদেরই সঙ্গে মিশিতে কালাচাঁদের প্রাণের একটা উৎকট বাসনা ছিল। পরিচিত মুখগুলির আকর্ষণ ও বাস্তুভিটার প্রলোভন তাহাকে সকল লাঞ্ছনা সহাইতেছিল। লাঞ্ছনা সহিয়া পুনরায় ইহাদের সহিত মিলিত হইবার আশায় কালাচাঁদ শ্রীক্ষেত্রে গেলেন।

শ্রীক্ষেত্রেও একথা প্রচারিত হইল; পাণ্ডারা বীরজাওনের ব্রাহ্মণগণের সাধচেষ্টায় অবগত হইল কালাচাঁদের জাতি গিয়াছে;

সুতরাং তাঁহারা কালাচাঁদকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিল না। লাঞ্ছনার পর লাঞ্ছনায় ক্রোধোন্মত্ত কালাচাঁদ মন্দিরের বাহিরে পড়িয়া 'হত্যা' দিলেন। কহিলেন,—হে প্রভু, হে অন্তর্য্যামী ভগবান্, তুমি সকলই জান। সমাজ আমাকে বিনাদোষে নিগ্রহ করিতেছে, আত্মীয় স্বজন আমাকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছে, হৃদয়হীন কপটগণ আমাকে অবজ্ঞা, অপমান করিতেছে। তুমি নাথ আমাকে গ্রহণ কর। শুনিয়াছি, তোমার নিকট জাতি নাই, বর্ণ নাই, তোমার নিকট সকলে সমান। তুমি অগতির গতি।

কালাচাঁদ অনাহারে তিন দিন বাহিরে পড়িয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার উপর কোন আদেশ হইল না। অনাহারে, ক্ষোভে অপমানেও ক্রোধে কালাচাঁদের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইল। চতুর্থ দিন প্রাতে কালাচাঁদ উঠিয়া বসিলেন, উচ্চস্বরে কহিলেন, যে ধর্ম্মে অনুতাপীর আশ্রয় নাই, হৃদয়ের আদর নাই, পবিত্রতার পুরস্কার নাই, উহা ধর্ম্ম নহে, বাহ্য কপটাচার মাত্র। বুঝিলাম, হিন্দুধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে। আর, হে দারুব্রহ্ম, বুঝিলাম তুমি দারু মাত্র; ব্রহ্ম নহ। ভণ্ডপ্রতারকেরা তোমার মিথ্যা মহিমার কীর্ত্তন করিয়া, সরল বিশ্বাসী লোকদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই বাহ্যাচার সারমাত্র প্রবঞ্চনাময় পৌত্তলিকতা, এবং এই ভণ্ডগণের কপট সমাজ ধ্বংস করিব। ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া একধর্ম্ম বিশ্বাসের ধর্ম্ম-হৃদয়ের ধর্ম্ম-স্থাপন করিব। প্রতারক-দিগের জীবনের উপায়—মূর্ত্তি আর ভারতে থাকিতে দিব না।

তিন দিনের অনাহারী কালাচাঁদ ক্রোধে, ক্ষোভে, ও অপমানে অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতবৎ হৃদয়ে দগ্ধ হইতে হইতে গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন। গৌড়বাসীরা তাহার চণ্ডমূর্ত্তি দেখিয়া প্রমাদ গণিল। বাদশাহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

অগ্ন্যুৎপাত।

অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কালাচাঁদের হৃদয়ের ক্রোধ ও অপমানের আগুন প্রজ্বলিত হইল।

বিশাল পাঠানবাহিনী লইয়া কালাচাঁদ শ্রীক্ষেত্র ধ্বংস করিতে গমন করিলেন। দূর হইতে সে বিশাল সৈন্যশ্রেণী ভীষণ পর্ব্বতবৎ দেখাইতে লাগিল। উড়িষ্যায় শব্দ উঠিল, "কালাপাহাড়" আসিতেছে।

উড়িষ্যাপতি তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের উড়িয়া সৈনিকগণ পাঠানের কামান ও তরবারীর মুখে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারিল না। কালাপাহাড়ের গতি ক্ষণকালের জন্য থামিল না। ভীত উড়িয়ারা যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিতে লাগিল।

কালাপাহাড় পুরীতে উপস্থিত হইলেন। মন্দির রক্ষার জন্য পাণ্ডা ও নগরবাসীরা কিছুকাল বৃথা চেষ্টা করিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে পাঠানগণ মন্দিরের দ্বার ভগ্ন করিয়া দারুবিগ্রহ বাহির করিয়া আনিল।

সমুদ্রের তীরে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইল। কালাপাহাড় নিজে দারুমূর্ত্তির গ্রীবায় ধরিয়া কহিলেন, হে দারু, হে ভণ্ডের পুতুল, আজ তোমার শেষ, ভারতের ভণ্ডামির শেষ, প্রতারণার শেষ। বলিতে বলিতে একে একে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। শুষ্ক ইন্ধন পাইয়া অগ্নি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিগ্রহ—দারুব্রহ্মের বিগ্রহ—

ভস্মীভূত হইল। মন্দির লুণ্ঠন করিয়া, উড়িষ্যা বিজয় করিয়া, পাঠান সৈন্য গৌড়ে ফিরিল।

কিন্তু আগুন নিভিল না। কালাপাহাড় কামাখ্যা ধ্বংস করিতে গমন করিলেন। তখন নরনারায়ণ কামরূপের রাজা, শিলারায় সেনাপতি। শিলারায়ের প্রবল প্রতাপে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত কামরূপের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু দৈব বশতঃ শিলা-রায় কামরূপে উপস্থিত ছিলেন না। কালাপাহাড়ের পাঠান সৈন্য গিরিগজবৎ কামরূপ বিমর্দ্দিত করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইল। মহাপীঠ কামাখ্যার মন্দির ধূলিসাৎ হইল, বিগ্রহ সকল চূর্ণ হইল, পাঠানের তরবারীর ভয়ে আর্য্য অনার্য্য বহু আসাম-বাসী ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

দক্ষিণ গেল, উত্তর গেল। এখন কালাপাহাড়ের রোষাগ্নি বারাণসী দহন করিতে—বিশ্বেশ্বরকে বিচূর্ণ করিতে উদ্যত হইল।

তখন বারাণসী জৌনপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দিল্লীর সম্রাট্ বেলোল লোদীর সহিত জৌনপুরের নবাবের বহুদিন যাবৎ সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছিল। বহু আয়াসেও সম্রাট্ জৌনপুরের নবাবকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

উড়িষ্যা ও আসাম জয় করিয়া কালাপাহাড় ভারত-বিখ্যাত হইয়াছেন। যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, কালাপাহাড়ের নাম শুনিলেই এখন বিপক্ষ সেনা প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে। তাহার সহচর পাঠান সেনার অত্যাচারে মুহূর্ত্ত মধ্যে জনপদ শ্মশান হইয়া যায়।

দিল্লীর সম্রাট্ কালাপাহাড়ের সহায়তায় জৌনপুর অধিকার করিতে মনন করিয়া, গৌড়ে পত্র সহ দূত পাঠাইলেন। পত্রে সমাট্ কালাচাঁদ রায়কে ধর্ম্মপিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া, দিল্লীর প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

দিল্লীশ্বরের সৌহার্দ্দপূর্ণ লিপি পাইয়া, কালাচাঁদ রায় আহ্লাদের সহিত সৈনাপত্য গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন। বাদশাহ সোলেমান আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন। অবিলম্বে দিল্লী যাত্রার উদ্যোগ হইল। বারাণসী ধ্বংসের সুযোগ আপনি উপস্থিত হইল দেখিয়া, কালাচাঁদ বড়ই আনন্দিত হইলেন।

সম্রাটের সহিত কথা হইল, জৌনপুর অধিকার করিয়া কালাপাহাড় বারণসী ধ্বংস করিবেন। পাঠান-সম্রাট্ কিছু মাত্র আপত্তি না করিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সমুদ্রবৎ বিপুল পাঠান সৈন্য লইয়া, ভৈরব নিনাদে মৃত্যুর করাল ছায়া বিস্তার করিয়া, কালাপাহাড় জৌনপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভয়ে নবাব-সৈন্য যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। জৌনপুর বিনা যুদ্ধে বিজিত হইল। নবাব পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

অর্দ্ধেক সৈন্য জৌনপুরে রাখিয়া, অপর অর্দ্ধ সহ কালাপাহাড় কাশীতে প্রবেশ করিলেন। তাহার অগামন-সংবাদে কাশীতে হাহাকার শব্দ উঠিল। নিবাসী, প্রবাসী, গৃহী, সন্ন্যাসী, যে যে দিকে পারিল, পলাইতে লাগিল। প্রাণের ভয়—ততোধিক জাতি ও ধর্ম্মের ভয়—কাশীবাসীর হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল।

অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডারা প্রমাদ গণিল ; মহাকাল বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু কাল ভৈরবের প্রস্তর মূর্ত্তি কাশী রক্ষা করিতে পারিল না। ত্রিশূলোপরি স্থিতা কাশী পাঠান সেনার পদভরে কাঁপিতে লাগিল।

গঙ্গাতীরে দিল্লীর প্রধান সেনাপতি কালাপাহাড়ের রক্তবর্ণ শিবির স্থাপিত হইল। কালাপাহাড় আদেশ করিলেন, মূর্ত্তি ও মন্দির ধ্বংস কর। ভীমদর্শন পাঠানসেনা মুক্তকৃপাণ হস্তে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শিলা ও ধাতুময় বিগ্রহগণ, তরবারী ও বর্ষার আঘাতে হস্ত-পদ-নাসা-কর্ণ-হীন হইয়া, পথের ধূলায় গড়াইতে লাগিল। সৈনিকগণের বিজয় নিনাদ কাশীবাসীর আর্ত্তনাদের সহিত মিশিয়া, কাশীতে প্রলয় কোলাহলের সৃষ্টি করিল।

হাজারী মনসবদার রহিম খাঁ কালাপাহাড়েব শিবিরে যাইয়া সেলাম করিয়া কহিল, হুজুর, দুই একটি মন্দির ব্যতীত সমুদয়ই চূর্ণ করা হইয়াছে। সৈনিকদিগের বিশ্রামের আদেশ হউক।

কালাপাহাড় প্রফুল্লমুখে কহিলেন, উত্তম। বিশ্বেশ্বরটার কি করিয়াছ ?

সেলাম করিয়া রহিম খাঁ কহিল, হুজুর সেটাও চূর্ণ করিয়াছি।

আচ্ছা, আজিকার মত সকলে বিশ্রাম কর।

মনে মনে কহিলেন, হে প্রস্তরের দেবতারা, তোমরাই নাকি অপরের রক্ষা করিয়া থাক ? কি প্রতারণা !

মূর্ত্তি।

বারাণসী ধ্বংস করিয়া কালাচাঁদের হৃদয়ের প্রজ্বলিত ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। উত্তেজনার পর অবসাদ আসিল। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইল।

গঙ্গাতীরে কালাচাঁদের শিবির। শিবিরে বসিয়া নগরবাসীর আর্ত্তনাদ শুনা যায়। শ্রীক্ষেত্র ও কামাখ্যায় এরূপ আর্ত্তনাদ কালাচাঁদ অনেক শুনিয়াছেন, কিন্তু আজি এ হাহাকার ও বিলাপ-ধ্বনি তাঁহার হৃদয়কে আকুল করিল। কালাচাঁদ বাহিরে আসিলেন। গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিলেন।

তখন দিঙ্মণ্ডল জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। জল, স্থল, বৃক্ষ, লতা স্নিগ্ধ কৌমুদিতে উজ্জ্বল হইয়া হাসিতেছে। মৃদুস্নিগ্ধ দক্ষিণ পবন গঙ্গার তরঙ্গগুলিকে নাচাইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। কালাচাঁদ, এই প্রশান্ত প্রফুল্ল প্রকৃতির দৃশ্য নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

কালাচাঁদ চাহিয়া দেখিলেন, রজত ধবল গঙ্গা আনন্দে কলনাদ করিয়া, নাচিতে নাচিতে কোথায় যাইতেছে; অনন্ত আনন্দ, অনন্ত গতি। কালাচাঁদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ গাহিতে লাগিলেন।

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি, বসুধা শৃঙ্গারহারাবলি,
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি।

এই পর্য্যন্ত গাহিয়া সহসা কালাচাঁদের মনে হইল, এই গঙ্গা,

এই শঙ্খকুন্দেন্দু ধবল আনন্দ-প্রবাহ—ইহাও ত মূর্ত্তি। এমন সময় দূরে কে গাহিল।

ও কার মূরতি মন, চিন কি উহারে ?
ওই যে করেছে এই বিশ্বরচনা, নৈলে হেন দৃশ্য
আঁকিতে আর কে পারে।

স্বর বড় মধুর, ভক্তি ও আনন্দের উচ্ছ্বাসময়। পবিত্র হোমশিখার ন্যায় উহা মর্ত্ত্য ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে কোন্ সুরপুরে উঠিতেছে। কালাচাঁদ, তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল, শরীর কণ্টকিত হইল। গায়ক গাহিতে লাগিলেন।

দ্বিভুজ কি চতুর্ভুজ কি দশভুজ বেশ,
হেরিয়া ভেবেছ মন, এই কি রূপের শেষ,
চিন্তিলে অন্তরে ওরে,
দেখিবে কি রূপ ধরে,
চিৎরূপে যে ভাতে, সেই এই অনন্ত বিশ্বাকারে—

বিমুগ্ধ কালাচাঁদ ভাবিলেন, এ কি কথা দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, দশভুজ, মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নররূপ একি তাঁরই রূপ? যিনি চিৎরূপ—অরূপ, তিনিই বিশ্বাকার, একি কথা! আমাকে এ কথা কে বুঝাইবে? প্রভু, তুমি কোথায়? আমি কি বুঝিয়াছিলাম, কি বুঝিয়া কি করিলাম? আমাকে কে বুঝাইবে? প্রভু, তুমি কোথায়? আমার চক্ষুরুন্মীলন কে করিবে? আমার এ রহস্য কে

বুঝাইবে ? বিশ্বে—এ জড়বিশ্বে—এ মৃত্তিকা–দারুপ্রস্তরে কে আমাকে চিৎরূপ দেখাইবে ?

গায়কের স্বর আরও উচ্চে উঠিল। কালাচাঁদ শুনিতে লাগিলেন :—

ও যে ধরে রে সহস্রবাহু সহস্র প্রহরণ,
সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ,
সহস্র বদনে খায়, সহস্র নয়নে চায়,
সহস্র শ্রবণে শুনে কথা রে ;
সহস্রশীর্ষা না হইলে কেবা ওরে অবোধ প্রাণ,
এতই গৌরবে করে সহস্র ধারায় স্নান,
সহস্র ব্রহ্মাণ্ড যারে,
হৃদয়ে ধরিতে নারে,
সেই ত বাস করে তোমার ও ক্ষুদ্র সহস্রারে ।

যিনি বাহিরে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে যাহার স্থান হয় না, তিনিই আবার ক্ষুদ্র জীব হৃদয়েও আছেন। এ কি রহস্য ? কালাচাঁদ ভাবিলেন, এ কি রহস্য ? গায়ক, গাহিল—

ও যে অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন, পাতে এমন ইন্দ্রজাল,
কভু কালীরূপে করে ধরে করাল করবাল ।
কখনো বা বংশী ধরি,
ত্রিজগতের মন হরি,
আনন্দ কাননে করে লীলা রে ;

কভু মহাকালরূপে শ্মশানেতে করে বাস,
রাজরাজেশ্বরী কভু মুখে মৃদু মৃদু হাস,
যে ভাবে যে জন চায়,
সেই ভাবে দেখা পায়,
ও যে জ্যোতিরূপে পরব্রহ্ম,শব্দরূপে ওঙ্কারে।

গাহিতে গাহিতে গায়ক কালাচাঁদের নিকটে আসলেন। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে কালাচাঁদ দেখিলেন, সম্মুখে প্রেমানন্দ বাবাজী। বাবাজী আনন্দে উৎফুল্ল, ভাবে বিভোর। ভাবমুগ্ধ বিগলিতচিত্ত কালাচাঁদ বাবাজীর পায় লুটাইয়া পড়িলেন, কাঁদিতে লাগিলেন।

বাবাজী বাহু প্রসারণ করিয়া, ভূলুণ্ঠিত কালাচাঁদকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। সে স্নিগ্ধ আলিঙ্গনের অমৃত স্পর্শে কালাচাঁদের অন্তর বাহির শীতল হইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে কালাচাঁদ কহিলেন,—প্রভু, আমি কি করিলাম ?

বাবাজী। বাবা, তুমি ভুল করিয়াছ। যাহার প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাই বিসর্জ্জন করিয়াছ।

কালাচাঁদ। আমার এ ভুল কেন হইল, প্রভু ?

বাবাজী। বাবা, 'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ', ক্রোধে তোমার মোহ জন্মিয়াছিল। এখন ক্রোধের আগুণ নিবিয়া গিয়াছে, অন্তরে বিষাদ আসিয়াছে, এখন মোহ যাইবে। কৃষ্ণ কৃপা করিবেন।

কাল্যচাঁদ। প্রভু, এতদিন আমাকে দেখা দেন নাই কেন?

বাবাজী। বাবা, সময় হয় নাই। তোমার প্রাক্তন ভোগ শেষ হয় নাই। ক্ষেত্র কর্ষিত না হইলে, কৃষক বীজ বপন করে না। এখন অবসাদ আসিয়াছে, ভোগের শেষ হইয়াছে, ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং—"

মোহবুদ্ধি গেলে, তবে নির্ব্বেদ আসে। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, কাশীতে আবার দেখা হইবে।

কালাচাঁদ। প্রভু, মোহ যায় নাই। এখনও কিছুই বুঝিতে পারি না, তিনি ত অরূপ, তবে মূর্ত্তি কেন?

বাবাজী। তিনি বিশ্বরূপ, কাজেই অরূপ। সবই যাঁহার রূপ, তাঁহাকে নিরাকার বলিতে ইচ্ছা হয়, বল, আপত্তি কি?

"সব রূপে রূপ মিশাইয়া তুমি আপনি নিরাকার"।

শুন, বাবা, ভগবান্ বলিয়াছেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে,
তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

"যে ভাবে, যে ভজে কৃষ্ণ, তারে তৈছে ভজে।"

তুমি, অরূপ ভাব, ক্ষতি কি? ঋষিরা বলিতেন—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
স পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং, নহি তস্য বেত্তা,"

তাঁহার হাত পা নাই, তবু তিনি গ্রহণ করেন, চলেন। তাঁহার চক্ষু নাই, দেখেন ; কর্ণ নাই, শুনেন। তিনি এ বিশ্বকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানে না।

এই ত অরূপের কথা। ঋষিরা কি বলিলেন, ধারণা করিতে পার কি ? তুমি মূর্ত্ত মানব, অনন্ত অগণিত মূর্ত্তির মধ্যে বাস করিয়া অমূর্ত্তির কথা—অরূপের কথা ধারণা করিতে পারিবে না। সে অধিকার বহু দূরে।

এখন মূর্ত্তির কথা। তুমি মূর্ত্ত, আমি মূর্ত্ত, এ জগৎ, এ ব্রহ্মাণ্ড, স্থলজল, জীব, উদ্ভিদ, স্থাবর, জঙ্গম, সবই ত মূর্ত্ত। বল দেখি বাবা, তুমি চির দিন এমনি ছিলে কি ?

কালাচাঁদ। কখনই না

বাবাজী। এমন ত ছিলেনাই, একবারেই ছিলে না। তুমি হইয়াছ, আবার তুমি থাকিবে না। আমিও ছিলাম না, হইয়াছি, আবার থাকিব না। এ জগৎও ছিল না, হইয়াছে, আবার থাকিবে না। যখন আমরা ছিলাম না, অর্থাৎ আমাদের মূর্ত্তি ছিল না,তখন আমাদের অমূর্ত্ত অবস্থা। এ জগৎ, এ ব্রহ্মাণ্ড, তুমি ও আমি, সেই অমূর্ত্তের মূর্ত্তি ; অরূপের রূপ। এ রূপ, এ মূর্ত্তি আবার অরূপ অমূর্ত্তি হইবে। উৎপত্তি আর লয়, লয় আর উৎপত্তি, ইহাই সেই বিশ্বরূপের লীলা। এখন ভাব দেখি, মূর্ত্তি কি ?

কালাচাঁদ। অরূপের রূপ হইল কেন ?

বাবাজী। ইহা সেই লীলাময়ের লীলা। পরমানন্দের

আনন্দ চাঞ্চল্য। রূপ না হইলে, মূর্ত্তি না হইলে জগৎ-লীলা হইত না। তাই রূপ হইয়াছে। অব্যক্ত হইতে জগৎ-ব্যক্ত হইয়াছে। অরূপ রূপ হইয়া, আপনার রূপ আপনি দেখিয়া আনন্দলীলা করিতেছেন।

"মুকুরে নেহারি রূপ সুখের নাহি ওর,
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর।"

তিনি একাংশে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ হইয়া—প্রকৃতি হইয়া পরম পুরুষরূপে তাহাতে ক্রীড়া করিতেছেন।

কালাচাঁদ।প্রভু, বুঝিলাম, এ বিশ্ব—এই স্থাবর জঙ্গম সমুদয় সেই বিশ্বেশ্বর জগন্নাথের মূর্ত্তি। তবে এ মূর্ত্তি সম্মুখে থাকিতে মানুষ মৃত্তিকা, প্রস্তর, ও কাষ্ঠদ্বারা—এই নশ্বর অসৎ পদার্থের দ্বারা সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপের আবার এক মনঃকল্পিত স্বতন্ত্র মূর্ত্তি গড়ে কেন?

বাবাজী। জগন্নাথের বিশ্বেশ্বরের বিশেষ প্রকাশের জন্য; মোহকলুষিত চিত্তের মোহচ্ছেদের জন্য। তুমি দেখি মৃৎ ও চিৎ এর স্বরূপ বুঝিতেছ না। প্রস্তর বল, মৃত্তিকা বল, দারু বল, সবই ত সেই অবিনাশী আনন্দময় অরূপ চিৎএর রূপ। মৃৎ ও চিৎএ প্রভেদ নাই। যাহা মৃৎ, তাহাই চিৎ। যাহা জড়, তাহাই চৈতন্য। চৈতন্যই জড়ে পরিণত হইয়াছে। জড় আবার চৈতন্য হইবে। তুমি যে মূর্ত্তিকে দারুময়ী, পাষাণময়ী বা মৃন্ময়ী বলিতেছ, ভাবিয়া দেখ, প্রকৃতপক্ষে উহা চিন্ময়ী। বিশ্বরূপ সম্মুখে থাকিতেও এ মূর্ত্তির প্রয়োজন আছে। নদী

সম্মুখে থাকিলেও ঘটী ভরিয়া জল তুলিয়া লইয়া পান করিতে হয়। নদী পান করা যায় না। বিশ্বরূপ বিশ্বমূর্ত্তি, ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না; তাই এ বাসনানুরূপ, সাধনানুরূপ গঠন। তিনি অনন্তরূপ, যার যে ভাবে রুচি, সে তাই গড়িয়া লয়। সম্মুখে অপার সমুদ্র, তোমার পাত্র যে আকারের থাকে, তাহাই ভরিয়া সেই আকারের জল পান কর, তৃষ্ণা মিটিবে। যে, যে ভাবে পান করুক, সবই সেই একই জল।

বাবাজী গাহিতে লাগিলেন :—

শ্যাম শ্যামা ভিন্ন কেবল আকারে,
ভিন্ন আকারে, ভিন্নাকার রে।
শ্যামা ধরে অসি, শ্যাম ধরে বাঁশী,
অট্ট হাসি, মৃদু হাসি যে অধরে।
বৃন্দাবনে শ্যাম, অপ্রাকৃত কাম,
মদনোন্মাদিনী শ্যামা, ধরে নাম,
যে, যে ভাবে ভাবে পূরে মনস্কাম,
প্রবর্ত্তে প্রভেদ ভিন্ন ভিন্নাকারে।
দশভুজারূপে শ্যামার এক মূর্ত্তি,
দশভুজে শ্যাম মদনগোপাল স্ফূর্ত্তি,
উভয়ের পূজার মূল প্রেম ভক্তি,
অভিন্ন প্রণব রকারে লকারে।

বুঝিলে বাবা, প্রভেদ কিছুই নাই। বস্তু এক বিশ্বেশ্বরের বিশেষ প্রকাশের জন্য; বিক্ষিপ্ত চিত্তের বিশেষ আকর্ষণের নিমিত্ত.

দারু, পাষাণ, ধাতু, ও মৃত্তিকা দ্বারা মূর্ত্তি গড়িয়া লওয়া হয়। সাধন-বলে ভক্তিযোগে এই দারু প্রস্তর মৃত্তিকাতে চিৎ-দর্শন হয়। তোমার মোহান্ধ নয়ন যাহাকে মৃন্ময়ী বলিয়া দেখে, ভক্তের দিব্যনেত্র উহাকে—ঐ জড় মূর্ত্তিকে চিন্ময়ী বলিয়া দেখিতে পায়। ভক্তের নিকট—সাধকের নিকট জড়ে চিৎ প্রকাশিত হন। এক-বার জড় চৈতন্যের স্বরূপ অবগত হইলে—চিত্ত তন্মনা তদ্ভক্ত হইলে --

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে কোন মূর্ত্তি,
যাহা যাহা নেত্রে পড়ে, তাহা কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি।"

কালাচাঁদ। প্রভু, যেরূপ মূর্ত্তি মানুষে গড়ে, ভগবান্ কি এরূপে সত্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অথবা উহা মনুষ্যের মনঃকল্পিত ?

বাবাজী। বাবা, ভগবান্ লীলা করিবার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুগে যুগে মূর্ত্ত হইয়া অবতীর্ণ হন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখন আমি আপনাকে সৃজন করি।

সাধুদিগের পরিত্রাণ, পাপীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

যত মূর্ত্তি দেখ, সকলরূপেই ভগবান আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ হইয়াছিলেন, তিনি বামণ-পরশু-

রাম-রাম রূপে আসিয়াছিলেন, তিনিই বংশীধারী, ত্রিশূলধারী, তিনিই জগন্নাথ ও বিশ্বেশ্বর। তিনিই কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, অন্নপূর্ণা হইয়াছিলেন। তাঁহার অনন্ত আবির্ভাব। ইহা ব্যতীতও ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা,
তদ্ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মন তেজোঽংশ সম্ভবম্।"

"যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সুন্দর বা তেজস্বী, তুমি তাহাই আমার তেজঃ-সম্ভূত বলিয়া জানিও।" অর্থাৎ সেই সকল পদার্থে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। যেমন জ্যোতি বা তেজ সকল পদার্থেই আছে, কিন্তু সূর্য্যে বিশেষ প্রকাশ।

কালাচাঁদ। প্রভু, আমি ত দারুব্রহ্মের মূর্ত্তি অনেক ক্ষণ দেখিয়াছিলাম, আমি উহাতে দারু ভিন্ন আর কিছু দেখিলাম না কেন? শ্রীমূর্ত্তির প্রতি আমার অবজ্ঞা বোধ হইল কেন?

বাবাজী। তোমার চিত্ত নির্ম্মল ছিল না। কিন্তু নির্ম্মল না হইলে, উহাতে চিৎ বিভাসিত হয় না। তাই তুমি দারুব্রহ্মকে চিন্ময় দেখিতে পার নাই। তোমার জগন্নাথ দর্শন হয় নাই। তুমি কাষ্ঠপুত্তলিকা মাত্র দেখিয়াছিলে। ভগবান্ বলিয়াছেন।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মনুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানাবিচেতসঃ
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।

যাহাদের আশা বিফল, কর্ম্ম বিফল, জ্ঞান বিফল, যাহাদের

চিত্ত বিক্ষিপ্ত, সেই সকল অসুর ও রাক্ষস-স্বভাবের (রজস্তমপ্রকৃতির) মূর্খ লোকগণ আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া, মানুষ দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে।

বাবা, তোমার প্রকৃতিও তখন ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় আসুরভাবাপন্ন ছিল। সুতরাং তুমি যে দারুমূর্ত্তি অবজ্ঞা করিবে, বিচিত্র কি ?

কালাচাঁদ। প্রভু, বুঝিলাম, কেন এ পাপীর *জগন্নাথ-দর্শন* হয় নাই। কিন্তু একটি কথা বুঝিতে পারিলাম না, আমি যখন অনাহারে তিন দিন মন্দিরের বাহিরে হত্যা দিয়া রহিলাম, তখন আমার উপর কোন আদেশ হইল না কেন ?

বাবাজী। বাবা, সে তিন দিনের মধ্যে তুমি একটিবারও জগন্নাথকে ভাব নাই। তোমার দেহ শ্রীক্ষেত্রে থাকিলেও তুমি কেবল গৌড় আর বীরজাওনে যাতায়াত করিতেছিলে; বধূ শাজাদীর মুখ দেখিতেছিলে, আর বীরজাওনের বামণগুলার মুণ্ডপাত করিতেছিলে। জগন্নাথকে একবারও ভাব নাই। তোমার দেহ শ্রীক্ষেত্রে থাকিলে কি হইবে, তুমি এক মুহূর্ত্তও শ্রীক্ষেত্রে ছিলে না। জগন্নাথ কাহাকে আদেশ দিবেন ? কালাচাঁদকে, না কালাচাঁদের মাংস-পিণ্ডকে ?

কালাচাঁদের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। উচ্চস্বরে কহিলেন, প্রভু ! আপনি অন্তর্য্যামী, যাহা কহিলেন, সবই-সত্য। আমি মহাপাপী ; আমার গতি কি হইবে ?

বাবাজী। বাবা, তোমার যখন অনুতাপ হইয়াছে, তখনই

তোমার গতি হইয়াছে। কৃষ্ণ, তোমায় কৃপা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।"

একমনে তাঁহাকে ভজিলে অতি দুরাচারও তাঁহার চরণে স্থান পায়। তাঁহার শ্রীক্ষেত্রে মহাপাপীরও স্থান আছে।

কালাচাঁদ। প্রভু, আমি কি শ্রীক্ষেত্র রাখিয়াছি? দারু-ব্রহ্ম ভস্ম করিয়া শ্রীক্ষেত্র ধ্বংস করিয়াছি। আমি মহাপাতকী, আমার স্থান নাই।

বাবাজী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, বাছা, অনাদি অব্যয় অনন্ত ব্রহ্ম ভস্ম করিবে, তোমার কি শক্তি আছে? যদি জগন্নাথের দারুমূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া থাক, তাহাতেইবা ক্ষতি কি? ভস্মও যে তিনি; তিনি ব্যতীত জগতে কিছু নাই। এ ব্রহ্মাণ্ড,—এবিশ্ব, তাঁহার শ্রীক্ষেত্র, ইহা ধ্বংস করিবার শক্তি তোমার নাই, কাহারও নাই। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে, ইহার একটি পরমাণুও বিচলিত হয় না। তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাও তাঁহারই ইচ্ছাতেই হইয়াছে। যাহার ইচ্ছায় উৎপত্তি, তাঁহার ইচ্ছাতেই প্রলয়। আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই যেমন শ্রীক্ষেত্র ছিল, তেমনই আছে, যেমন দারুব্রহ্ম ছিলেন, তেমনই আছেন। তুমি আমি নিমিত্ত-মাত্র, কর্ত্তা একমাত্র তিনি। তুমি একান্তমনে জগন্নাথের শরণ লও, তিনি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিবেন, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইবেন। ভগবান্ বলিয়াছেন।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু,
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র তাহার শরণ লও, তন্মনা, তদ্ভক্ত, তদ্যাজী হও, তাঁহাকে—সেই পরমানন্দকে প্রাপ্ত হইবে।

বাবাজী অন্তর্হিত হইলেন।

কিছুকাল পরে, কালাচাঁদ চাহিয়া দেখিলেন, বাবাজী আর সেখানে নাই। চারি দিকে চাহিলেন, কোথায়ও দেখিলেন না। কালাচাঁদ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন।

সম্মুখে রজত-ধবল-গঙ্গা শুভ্র চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়া কল কল নাদে তেমনই বহিয়া যাইতেছিল। চঞ্চল তরঙ্গ-শিশুগুলি চঞ্চল বাতাসের সহিত তেমনই খেলা করিতেছিল। কালাচাঁদ বাহুক্ষণ সেই পুণ্য-প্রবাহের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গুরূপদেশে ও গুরুর শক্তিতে কালাচাঁদের দিব্যদর্শন লাভ হইয়াছে; কালাচাঁদ, রূপে অরূপ, মূর্ত্তিতে অমূর্ত্তি, জড়ে চিৎ-রূপ দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শঙ্খেন্দুধবলা গঙ্গা আর সামান্য জলপ্রবাহ নহে, উহাতে চিৎও আনন্দ বহিয়া যাইতেছে। চন্দ্র-কিরণে চিদানন্দ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সমীরণে সেই চিদানন্দ বাহিত হইতেছে। কালাচাঁদ মুগ্ধ হইলেন। চিৎরূপ, আনন্দরূপ, অমৃতরূপ দেখিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গা-প্রবাহের নিকটে আসিলেন। গদ্ গদ্ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেনঃ—

"গাঙ্গংবারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতং,
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাং।"

অশ্রুপ্লাবিতগণ্ডে গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে কালাচাঁদ গঙ্গাজলে নামিলেন। মুহূর্ত্তে এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে কোথায় লইয়া গেল। আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

প্রভাতে বড় বড় মন্‌সবদারেরা সেনাপতির রক্তবর্ণ শিবিরে আসিয়া দেখিলেন শয্যাশূন্য; প্রহরী কিছু বলিতে পারিল না। অনুসন্ধান করিয়া কোথায়ও সেনাপতিকে পাওয়া গেল না। শিবির উঠাইয়া পাঠানসেনা দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিল। কাশীতে প্রবাদ উঠিল, কালাপাহাড় কালভৈরবের অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন।

সাধনা।
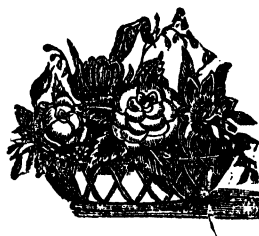
গৌড়ে সংবাদ গেল, সহসা কালাচাঁদ রায় বারাণসীতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার কি হইয়াছে, তিনি জীবিত আছেন কি মরিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না। বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাকে পাঁওয়া যায় নাই।

বাদশাহ সোলেমান এ সংবাদ শুনিয়া অশ্রুমোচন করিলেন, বেগম হায় হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু শাজাদী দুলালী কাঁদিলেন না। মাকে বলিলেন, মা এমন হইতে পারে না, তিনি দাসীকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। তোমরা কাঁদি-ওনা; আমার বারাণসী যাত্রার উদ্যোগ করিয়া দাও। আমি বারাণসী যাইব। তিনি আমায় ডাকিতেছেন।

শত অশ্বারোহী সঙ্গে দিয়া বাদশাহ সোলেমান কন্যাকে বারাণসী পাঠাইলেন। যেখানে কালাচাঁদের রক্তবর্ণ শিবির স্থাপিত হইয়াছিল, ঠিক্ সেই খানে তেমন ভাবে শাজাদীর শ্বেত শিবির স্থাপিত হইল।

কাশীর লোকে শুনিল কালাপাহাড়ের স্ত্রী,—গৌড়ের বাদ-শাহের কন্যা আসিয়াছেন। ভয়ে দলে দলে লোক আবার কাশী ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। শাজাদী, সেনাপতি রহিম খাঁকে কহিলেন,ঢোল পিটিয়া দাও, কাশীতে কোন অত্যাচার হইবে না। কেহ যেন কাশী ছাড়িয়া না যায়। এই একশত আসরফি বিশ্বেশ্বরের সেবার জন্য দিয়া আইস। 'যে যে মন্দির ও বিগ্রহ

দিল্লীর সেনারা ভগ্ন ও বিধ্বস্ত করিয়াছে, আমি তাহার সংস্কার করিব। তোমরা উদ্যোগ কর।

সন্ধ্যাকালে মোতিয়াকে ডাকিয়া কহিলেন, মোতিয়া, যে পালঙ্কে যে শয্যায় তিনি শয়ন করিতেন, উহা সঙ্গে আসিয়াছে, উহা যেমন ছিল, তেমন করিয়া স্থাপন কর। যে বাটায় তিনি পান খাইতেন, উহাতে তেমন করিয়া পান সাজাইয়া রাখ, যে আলবোলায় তিনি তামাক খাইতেন, উহাতে সুগন্ধি তামাক সাজিয়া বিছানার নিকটে রাখ। বিছানার উপর গোলাপ, বেলি, চামেলী ছড়াইয়া দেও। বলিতে বলিতে শাজাদীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ এবং মুখ গম্ভীর হইল। মোতিয়া কিছু বলিতে সাহস করিল না। মনে মনে ভাবিল, শাজাদী কি উন্মাদিনী হইলেন?

শয্যা রচনা হইল, তামাক সাজা হইল, শয্যায় ফুল বিছান হইল। শাজাদী বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দশীর উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে প্রকৃতি হাসিতেছে। সেই স্নিগ্ধ জোৎস্নায় আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া কলনাদিনী গঙ্গা কুলুকুলু নাদে কি প্রেম-বিরহগাথা গাহিতেছে, সে গানে আনন্দ ও বেদনা, বিরহ ও মিলন বিশ্বে জাগাইয়া দিতেছে। শাজাদী অশ্রুপূর্ণনেত্রে মোতিয়ার দিকে চাহিয়া কহিলেন, মোতিয়া, আমার কক্ষে আমি একা থাকিব। প্রহরীদিগকে সতর্ক করিয়া দেও, আমার শিবিরের নিকটে কেহ না আসে, গঙ্গাতীরে কেহ না যায়। তুই আমার সেতারটা দিয়া চলিয়া যা। প্রভাতের পূর্ব্বে আর আসিস্ না।

মোতিয়া চলিয়া গেল। শাজাদী গঙ্গার দিকে প্রকোষ্ঠের

দ্বার খুলিয়া দিলেন। স্নিগ্ধনৈশ সমীরণ তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, সুশীতল স্পর্শে দিব্য আনন্দ ও বেদনা সঞ্চার করিতে লাগিল। শাজাদী পুষ্পশয্যার নিকটে ভূমিতে বসিয়া সেতার হাতে লইলেন। চন্দ্রালোক তাঁহার অনিন্দ্য কমনীয় দেহের উপর আসিয়া পড়িল। শাজাদীকে কৌমুদীস্নাত শুভ্র দ্বিতীয় গঙ্গার ন্যায় দেখাইতে লাগিল।

গঙ্গায় কুলু কুলু করুণ গান; শাজাদীর সেতার কাঁপিতে কাঁপিতে সে তানে তান মিশাইল। নৈশ শীতল সমীরণ করুণা-মাখা বেদনাজনক স্পর্শে সে তান বাড়াইয়া দিল। স্নিগ্ধ জোৎস্নায় বিরহ ও বেদনা গলিয়া পড়িতে লাগিল। শাজাদী কাঁদিতে২ গদ্গদকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন।

আমি নিশিদিন আছি নাথ তব
পথ পানে স্বধু চাহিয়া।
কোথা তুমি প্রভু, নিমেষে নিমেষে
কত যুগ যায় চলিয়া।
হিয়া চাহে তব হিয়ার সঙ্গ,
প্রতি অঙ্গ মম চাহে প্রতি অঙ্গ,
আকুল তৃষিত পরাণ আমার,
রাখিতে পারি না ধরিয়া।
এস নাথ, এস হৃদয় আসনে,
পুলকিত কর প্রেম-পরশনে,

এ অশ্রু বেদনা এত আকিঞ্চন,
সফল করহ আসিয়া।
প্রাণের পিপাসা হৃদয়ের আশা,
তুমি কি জান না প্রভু?
নয়নে নয়নে রয়েছ লাগিয়া,
ভুলিয়া রয়েছ তবু;
লহ নাথ, লহ মোরে,
আর ত পারি না বহিতে এ ভার
ধরহ আমারে আসিয়া,
আমি দরশে পরশে অবশ অঙ্গে
তোমাতে যাইব মিশিয়া।

ভাগীরথীর কলনাদের সহিত মিলিয়া শাজাদীর বেদনামাখা করুণগীতি সেতারের ঝঙ্কারে দিঙ্‌মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল। সমীরণ কাঁদিতে কাঁদিতে সেই অশ্রুধৌত প্রেমগীতি—সেই কাতর নিবেদন ও আকুল আহ্বান কোথায় বহন করিয়া লইয়া গেল; কিন্তু কেহ আসিল না।

চন্দ্রমা অস্ত গেল। পাখিগণ প্রভাতের প্রথম কলনাদ করিয়া উঠিল। শাজাদী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সেতার রাখিয়া দিলেন। দ্বাররুদ্ধ করিলেন।

মোতিয়া আসিল। দেখিল, শাজাদীর চক্ষু রক্তবর্ণ, উহা-হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িয়া গণ্ড ভাসাইয়া দিতেছে। মোতিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কহিতে পারিল না।

কিছু কাল পরে কহিল, শাজাদী ! কিছু আহারের উদ্যোগ করি ? শাজাদী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, না মোতি, কাশীতে আমার উপবাস। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা না মিটিলে সুধু দেহের পিপাসা মিটাইয়া কি হইবে মোতি ? দেখি অন্নপূর্ণা কি করেন। মোতি, আমি একাকী থাকিব। সন্ধ্যাকালে আবার আসিও। রহিম খাঁকে বলিও, মন্দিরের সংস্কার যেন হয়। এই চাবি লও ; যত অর্থ লাগে দিও। আমাকে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। আজ মধ্যাহ্নে অন্নপূর্ণার ভোগের জন্য এক শত আস্‌রফি পাঠাইয়া দিও।

দিন গেল। সন্ধ্যাকালে মোতিয়া আসিয়া তেমনই করিয়া পুষ্পশয্যা রচনা করিল, তামাক ও পান সাজিল। শাজাদী দ্বার খুলিয়া দিয়া সেতার লইয়া বসিলেন। সেতারে বিশ্বদ্রাবী করুণ তান বাজিয়া উঠিল। শাজাদীর গণ্ডে অশ্রুর পর অশ্রু পড়িতেছে, গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে হৃদয়ের বেদনা, প্রাণের কামনা উছলিয়া উঠিতেছে। সেই বেদনা ও কামনা গঙ্গাবক্ষে দিঙ্মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিশ্বপ্রকৃতি কাঁদিয়া উঠিতেছে।

সে দিন পূর্ণিমা। শুভ্রোজ্জ্বল চন্দ্রালোক মুক্তদ্বার পথে শাজাদীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। শয্যার শ্বেত-পুষ্পগুলি সে আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ সমীরণের ধীর স্পর্শে আলবালা হইতে সুগন্ধি তামাকের ধূম বাহির হইতে লাগিল। শাজাদী শিহরিলেন। তাঁহার ভ্রম হইল যেন কুসুম শয্যায় অর্দ্ধ-শায়িত হইয়া কালাচাঁদ তামাক খাইতেছেন। মুহূর্ত্তে সে ভুল

ভাঙ্গিল। কিন্তু তাহার মনে হইল, এখনই তিনি আসিবেন। হায় আশা!

সহসা কণ্ঠে অমৃতবর্ষণ করিয়া গঙ্গাবক্ষে কে গাইল :—

"রস প্রেমে যে দিয়াছে ডুব,
শমনে কি কর্‌বে তারে, গুরু যারে দিয়াছে হুঁস।"
সে যে অরূপের রূপ, রূপে হেরে,
রূপ দিয়া সে অরূপ ধরে,
তার নয়নেতে মাণিক জলে,
মদন রে তোর বুঝের ভুল।

স্বরে ভক্তি ও প্রেম, শান্তি ও সৌন্দর্য্য উজলিয়া উঠিতেছে; শাজাদী উৎকর্ণ হইয়া গীত শুনিতে লাগিলেন। গীতধ্বনি ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল।

কিছুকাল মধ্যে দ্বারপথে মনুষ্যের ছায়াপাত হইল। শাজাদী দেখিলেন, চন্দ্রালোকের মত উজ্জ্বল-গৌরকান্ত সমুচ্ছ্রিতকায় এক মহাপুরুষ। আনন্দ ও শান্তি, করুণা ও প্রেম সে অঙ্গে যেন বহিয়া পড়িতেছে। অপরিচিত বর্ষীয়ান্ পুরুষকে দেখিয়া শাজাদীর লজ্জা হইল না, ভয় হইল না। শিশু যেমন মায়ের কোলে যায়, বৎস যেমন গাভীর দিকে ছুটে, শাজাদী তেমনই করিয়া সেই মহাপুরুষের দিকে অগ্রসর হইলেন, মহাপুরুষের পদপ্রান্তে যাইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

বাবাজী কহিলেন—মালক্ষ্মী, উঠ মা; তোমার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে।

কাতরকণ্ঠে শাজাদী কহিলেন,—বাবা আমার আশা পূর্ণ হইবে কি ?

বাবাজী কহিলেন,—এত প্রেম কি মা বিফল হয়? কালাচাঁদ মরিত, তোমার আকর্ষণেই সে জীবিত আছে। আজই তাহাকে পাইবে। কিন্তু মা আর সংসারে থাকিও না। সংসার এ প্রেম-সাধনার ক্ষেত্র নহে।

বাবাজী, শাজাদীর মস্তকে হস্তস্পর্শ করিলেন। সে স্নিগ্ধ-স্পর্শে শাজাদীর হৃদয়ের গ্রন্থি মুক্ত হইল। বাবাজী অন্তর্হিত হইলেন।

আশা ও আনন্দে শাজাদীর সেতার বাজিতে লাগিল।

আকর্ষণ।

ভাবমুগ্ধ কালাচাঁদ যখন গঙ্গায় নামিয়া কহিলেন, "পুনাতুমাং" অমনি এক প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে জলমগ্ন করিল। কালাচাঁদ স্রোতোবেগে কোথায় ভাসিয়া গেলেন।

যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন দেখিলেন, শিয়রে প্রেমানন্দ বাবাজী। কালাচাঁদ কহিলেন, প্রভু, আমি কোথায়?

বাবাজী। আমার আশ্রমে।

কালাচাঁদ। কেমনে এখানে আসিলাম?

বাবাজী। স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছ?

কালাচাঁদ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছু মনে হইল না। বাবাজী কহিলেন, কিছু দুগ্ধ পান কর।

কালাচাঁদ দুগ্ধ পান করিলেন। একটু পরে সুস্থির হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

বাবাজী কহিলেন,—কালাচাঁদ চৈতন্যলাভের পূর্ব্বে কি দেখিতেছিলে?

কালাচাঁদ নিরুত্তর।

বাবাজী কহিলেন, শাজাদীকে নয় কি?

লজ্জাবনত মুখে কালাচাঁদ কহিলেন—প্রভু তাই-ই।

বাবাজী। শাজাদীকে ভুলিতে পার না?

কালাচাঁদ। প্রভু কেমনে ভুলিব? আমি যে দিকে চাই, তাহাকেই দেখি। অন্তরে বাহিরে কেবলই সে।

বাবাজী। বুঝিলাম, শাজাদী এখন তোমার বিশ্বময় হইয়াছে।

কালাচাঁদ। কি জানি প্রভু, তাহাকে ছাড়া আর কিছু দেখি না।

বাবাজী। তবে "যো কুছ মুঝে তুঁহি হৈ হইয়াছে। ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। তোমাকে বীরজাওনে ইহাই বলিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র শাজাদী এখন বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছে, ক্ষুদ্র প্রেম মহাপ্রাণে পরিণত হইয়াছে। এখন স্থাবর-জঙ্গম সবই শাজাদী। শাজাদীকে অবলম্বন করিয়া তুমি বিশ্বেপ্রেম—অনন্ত প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছ। অনন্তকে আপনার বলিয়া বুঝিয়াছ। বীরজাওনে বলিয়াছিলাম, মানুষ ক্ষুদ্র মানুষকে অবলম্বন করিয়া অনন্ত-স্বরূপের সন্ধান পায়, অনন্তকে আয়ত্ত করে। শাজাদী, তোমার প্রেম-মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি অবলম্বন না করিলে, এ আনন্দের কাছে যাইতে পারিতে না। এমন তন্ময় হইতে পারিতে না। কিন্তু "যারে দেখিলে আনন্দ বাড়ে" এমন নৃমূর্ত্তি সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সেই জন্য শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। আপনার মনের মতন করিয়া গড়িয়া, মনের মতন করিয়া সাজাইয়া মানুষ তাহাতে চিত্ত আধান করে। সাধন-বলে সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি বিশ্বব্যাপী হয়, অনন্তস্বরূপ হয়।

বাবা, এখনও কিন্তু বাকী আছে। তুমি জগৎ শাজাদীময় দেখিতেছ, কিন্তু তুমি শাজাদী হইতে পার নাই। তাই, এখনও মূর্ত্তির প্রয়োজন আছে। সেই প্রেমমূর্ত্তি তোমাকে আহ্বান করিতেছে, আকর্ষণ করিতেছে. বুঝিতেছ কি ?

কালাচাঁদ। প্রভু, জানি না, কেন বারাণসী যাইবার আগ্রহ হইতেছে। মনে হইতেছে যেন শাজাদী সেখানে আছে।

বাবাজী। শাজাদীকে কেমন দেখিতেছ ?

কালাচাঁদ উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ভূমিতে লুঠাইয়া কহিতে লাগিলেন, হায় অশ্রুমুখী প্রিয়ে! তোমার বেদনা আমার বুকে বাজিতেছে।

বাবাজী কহিলেন,—বাছা উঠ, বারাণসী চল। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। সেই প্রেমিকার অদ্ভুত সাধনা তোমার মৃতদেহে জীবন দিয়াছে। তুমি মরিয়াও মর নাই। তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। আর সংসারে থাকিবার প্রয়োজন নাই। নবীন জীবনে শাজাদীকে লইয়া প্রেমের শ্রীক্ষেত্রে গমন কর।

গুরু ও শিষ্য বারাণসী অভিমুখে চলিলেন। বাবাজী গাহিতে লাগিলেন—

রসপ্রেমে যে দিয়াছে ডুব,
শমনে কি করবে তারে,
গুরু যারে দিয়াছে হুঁস।

সিদ্ধি।

বাবাজীর অন্তর্দ্ধানের পর, শাজাদী সেতারের করুণতানে করুণকণ্ঠ মিশাইয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে আবাহন-গীতি গাহিতে লাগিলেন। গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে সে ক্রন্দন দিগন্তে ছুটিয়া চলিল।

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে শয্যাবিকীর্ণ শ্বেত পুষ্পদাম উজলিয়া উঠিয়াছে, মৃদুপবনে আলবোলা হইতে সুগন্ধি তামাকের ধূম উদ্‌গীর্ণ হইতেছে, শাজাদীর একবার ভ্রম হইতেছে, বুঝি কালাচাঁদ আলবোলা টানিতেছেন। কখনও নৈশ সমীরণের শীতলস্পর্শ, কালাচাঁদের আলিঙ্গন বলিয়া ভ্রম করিয়া শাজাদী শিহরিয়া উঠিতেছেন। মুহূর্ত্তে ভুল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার কপাল বাহিয়া অশ্রুমালা গড়াইয়া পড়িতেছে।

একবার মুখ তুলিয়া শাজাদী গঙ্গাতীরের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি—কালাচাঁদের মতই শালপ্রাংশুবৎ উন্নত, তেমনই বিশালোরস্ক ; শাজাদীর বক্ষ ভীমবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল, ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিল। মূর্ত্তি ধীরে ধীরে শিবিরের দিকে আসিতেছে। শাজাদী অনিমেষনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি শিবিরের দ্বারে আসিল। তার পর শিবিরে প্রবেশ করিল। শাজাদী চীৎকার করিয়া, কালাচাঁদকে আলিঙ্গন করিয়া, মূর্চ্ছিত হইলেন। কালাচাঁদেরও মূর্চ্ছা হইল। সেই পুষ্পাকীর্ণ শ্বেত শয্যার উপর

দুইটি প্রফুল্লপদ্মের মত প্রেমিক যুগল মূর্চ্ছিত হইয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ পরে উভয়েরই মূর্চ্ছাপগম হইল, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে শাজাদী কহিলেন, দাসীকে ভুলিয়া এত দিন কোথায় ছিলে? তেমনই গদ্‌গদকণ্ঠে কালাচাঁদ কহিলেন, প্রিয়ে, আমি কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারি নাই; তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি নাই। আমার অন্তরে তুমি, বাহিরে তুমি। এ চক্ষুতে তোমাকে ছাড়া জগতে আর কিছু দেখি না। তুমিই আমার জগৎ, তুমি আমার জীবন। প্রেমভরে শাজাদীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া কালাচাঁদ কহিলেন, প্রিয়ে, এখানে আর থাকা হইবে না; শীঘ্র চল।

শাজাদী কহিলেন,—কেন নাথ?

কালাচাঁদ। আমি কালাপাহাড় ছিলাম, আমি নিজে মূর্ত্ত-মানব হইয়া, শ্রীমূর্ত্তির ধ্বংশ করিয়াছি। তখন বুঝি নাই, বিশ্বের সবই মূর্ত্তি; আমার ভুল হইয়াছিল। সেই ভুলে আমি বিশ্বধ্বংশ করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। কাজেই সংসারে আমার স্থান নাই। তাই, কালাপাহাড় মরিয়াছে। চল, প্রেমের ক্ষেত্র—যেখানে জাতিবর্ণের বিচার নাই, সেই জগৎ-ছাড়া জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্রে যাই।

শাজাদী। কালাপাহাড় মরিয়াছে, মরুক। আমার কালা-চাঁদ আছে। কালাচাঁদের কাশীবাসে আপত্তি কি?

কালাচাঁদ। প্রিয়ে. প্রভুর আদেশ. সেই প্রেমের ক্ষেত্রে যাইতে হইবে।

শাজাদী। তাহাই হউক! কিন্তু এক দিন এখানে থাকিতে হইবে। মোতিয়া তোমাকে দেখিবে। সে আমার ব্যথার ব্যথিত, দুঃখের সঙ্গিনী। আর বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ পাইতে হইবে। আমি কাশীতে আসিয়া, তোমার সঙ্গে একত্র প্রসাদ পাইব বলিয়া, উপবাসী আছি।

শাজাদীর কঠোর ব্রতের কথা শুনিয়া, কালাচাঁদের চক্ষে জল আসিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আবেগভরে কহিলেন, প্রিয়ে, আমাকে শতজন্মের জন্য স্নেহের ঋণে বাঁধিলে।

শাজাদীর চীৎকার শুনিয়াই মোতিয়ার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে নাই, শাজাদীর নিষেধ ছিল। প্রভাতে মোতিয়া শাজাদীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল; তখনও প্রণয়িযুগল একাসনে বসিয়া অশ্রু মোচন করিতেছেন। মোতিয়াকে দেখিয়া শাজাদী কহিলেন, আয় মোতি, তুই আমার দুঃখের সঙ্গিনী, সুখের ভাগিনী; আয়, আজ আমার দুঃখের অবসান হইয়াছে। মোতিয়া নিকটে আসিল।

কালাচাঁদকে দেখিয়া মোতিয়ার আনন্দ হইল; চক্ষে জল আসিল; আবার একটু ক্রোধও হইল। ইহাই ভালবাসার ধর্ম্ম। মোতি কহিল, রায় সাহেব, এমনি করিয়া কাঁদাইতে হয়? আপনি বড় কঠিন।

অপরাধীর ন্যায় কুণ্ঠিত হইয়া, কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, মোতি আমার দোষ নাই। অদৃষ্টবশে এমন হইয়াছে। আমায় ক্ষমা কর।

শাজাদী কহিলেন,—মোতি উনি যে আসিয়াছেন, একথা তুই বই আর যেন কেউ না জানে। উনি কালাপাহাড় হইয়াছিলেন জানিস, কাশীর সকলে জানে, কালাপাহাড় মরিয়া গিয়াছে। সত্যই কালাপাহাড় মরিয়াছে ; আমি কালাচাঁদ লইয়াই আছি।

এখন যা, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ লইয়া আয়, আমার শিবিরের কাছে কেউ না আসে, সাবধান করিয়া দে।

প্রসাদ আসিল। মোতিয়াকে লইয়া প্রণয়ী-যুগল প্রসাদ পাইলেন।

শাজাদী হাসিয়া কহিলেন, প্রভু, মূর্ত্তির প্রসাদ কেমন লাগে ? কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রিয়ে, প্রসাদও যে, মূর্ত্তি। এখন আর মূর্ত্তি ছাড়া কিছু চাহি না। কি ভুলই তখন করিয়াছিলাম।

শাজাদী কহিলেন, মোতিয়া তামাক সাজিয়া দে। উনি পালঙ্কে বসিয়া, আলবোলায় তামাক খাইতে থাকুন, তুই আর, আমি দেখি। এরূপ দেখা আজই শেষ, মোতি।

মোতিয়া শিহরিয়া উঠিল। বলিল, এ কি বলিলেন শাজাদী ? শাজাদি কহিলেন, মোতি, ঠিকই বলিয়াছি। শোন্, আমার যা কিছু আছে, তোকে লিখিয়া দিতেছি। কালই সকল লইয়া গৌড়ে চলিয়া যাস্।

কেন শাজাদী তোমরা যাইবে না ?

না, মোতি, আমাকে আর ফিরিতে হইবে না। মাকে, বাবাকে আমার শত কোটী সেলাম জানাইয়া বলিস্, তাঁহাদের জামতা

যে পথে যে ভাবে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে সেই ভাবে গিয়াছি। ইহার অধিক কিছু বলিবার নাই।

এখন যা, সন্ধ্যাকালে আবার আসিস্। মোতিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইল। প্রহরী মোতিয়াকে কাঁদিতে দেখিয়া কহিল কাঁহে রোতে ?

মোতি কহিল, নেহি আঁখমে দরদ হুয়া।

সন্ধ্যাকালে মোতিয়া আসিল। শাজাদি তাহার হাতে এক খানি কাগজ ও এক গোছা চাবি দিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে চিরসঙ্গিনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, মোতি, প্রাণের মোতি, যে কয়েক দিন বাঁচিস্, আমার প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া যাইস্ না। এই আমার শেষ আলিঙ্গন।

মোতিয়া, মাটীতে লুঠাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

শাজাদী, মোতিয়াকে ধরিয়া তুলিলেন। কহিলেন, প্রাণের মোতি, আজ আমার সুখের দিন, আমি সুখী হইলাম বলিয়া, তুই সুখী হ। তোর ক্রন্দনে আমার বুক ফাটিয়া যায়, কাঁদিস্ না। মাকে বুঝাইয়া বলিস্, তাঁহার মেয়ে নারীর যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছে। তুই মার কাছে থাকিস্। আমারই মত মাকে মা বলিয়া ডাকিস্।

অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে মোতিয়া বিদায় হইল। শাজাদী দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। প্রকৃতি নীরব। উজ্জ্বল চন্দ্রালোক নীরবে বৃক্ষে, লতায়, পত্রে, পুষ্পে, জলে, স্থলে পড়িয়া উজলিয়া

উঠিয়াছে। নৈশ স্নিগ্ধ সমীরণ নীরবে বহিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে বিশ্বের সেই নীরবতা ভাঙ্গিয়া গঙ্গা-গর্ভ হইতে সঙ্গীত উঠিল—

মন, আনন্দ-স্বরূপে কেন ভাব না।
মিছা মোহে ভুলি, নিয়ে ভস্ম ধূলি,
মিছা দুঃখে কেন ভুল রে আপনা।

গীত শুনিয়া কালাচাঁদ কহিলেন, প্রিয়ে, প্রভু আসিয়াছেন আর বিলম্ব কেন? চল।

দুইটি মনিদীপের মত দম্পতী শিবির হইতে বাহির হইলেন।

সম্মুখে কলনাদিনী গঙ্গা মৃদুমধুরনাদে যেন আয় আয় বলিয়া ডাকিতেছে, শুভ্র স্নিগ্ধ তরঙ্গের হস্ত তুলিয়া যেন আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে। দম্পতী, গঙ্গার দিকে চলিলেন।

কিছু দূর যাইয়া শাজাদী কহিলেন,—প্রভু, একবার জন্মের মত পিতার পটগৃহ দেখিয়া লই। কালাচাঁদ দাঁড়াইলেন। শাজাদী পশ্চাৎ ফিরিয়া শিবিরের দিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। হায় রে মায়া!

পরদিন প্রভাতে মোতিয়া শাজাদীর প্রকোষ্ঠে আসিল। দেখিল, শয্যায় শুভ্র কুসুমরাশি তেমনই বিকীর্ণ রহিয়াছে, পানের বাটায় পান তেমনই রহিয়াছে, আলবোলায় তেমনই তামাক সাজা রহিয়াছে—কিন্তু হায়, শুভ্রকুসুমের মত—স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত শাজাদী সে প্রকোষ্ঠে নাই। মোতিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।